## কমর মুশতারী

জন্ম ১১ অক্টোবর, ১৯২৬। ঢাকা জেলার পাইকপাড়া গ্রামে মাতৃগৃহে। কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ১৯৪৪ সালে।

পিতা কামরুজ্জামান খান পুলিশের চাকরি করতেন। পিতার চাকরির সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁর শৈশবকাল কেটেছে।

১৯৪৬ সালের ৭ জুলাই হাওড়ার বাউড়িয়া থানায় অবস্থানকালে সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দুই কন্যা ও দুই পুত্রসন্তানের জননী ছিলেন। সাংসারিক জীবনে সকল প্রকার দায়দায়িত্ব পালনের পরও তিনি আমৃত্যু সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় কলকাতার মাসিক '*সওগাত*' পত্রিকায় কার্তিক ১৩৫৩ সংখ্যায়। গল্পের নাম ছিল 'পূর্বাপর'। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে তাঁর রচিত গল্পসমূহ পুস্তক আকারে গ্রন্থিত হয়ে '*পূর্বাপর*' নামে নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ সালে '*অশান্ত মন শান্ত হোল*' নামে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। দুটি গ্রন্থ মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে – '*শরণার্থী জীবনের কথা*' এবং '*রান্নার কথা*'।

উল্লেখ্য, কমর মুশতারী অত্যন্ত সুখ-শান্তিতে সাংসারিক জীবন কাটিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, মানবতাবাদী, শান্তিপ্রিয় ও উদারমনা ছিলেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সপরিবারে ভারত গমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সে দিনগুলিতে তিনি সংসারের সকল দায়দায়িত্ব পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে স্বামী অধ্যাপক আলী আহসান সাহেবকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একাগ্রচিত্তে কাজ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ড, আমেরিকা সহ বিশ্বের প্রভূত দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। ১৯৮৩ সালের ১৭ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।

বেগম কমর মুশতারী আহসান স্মরণে

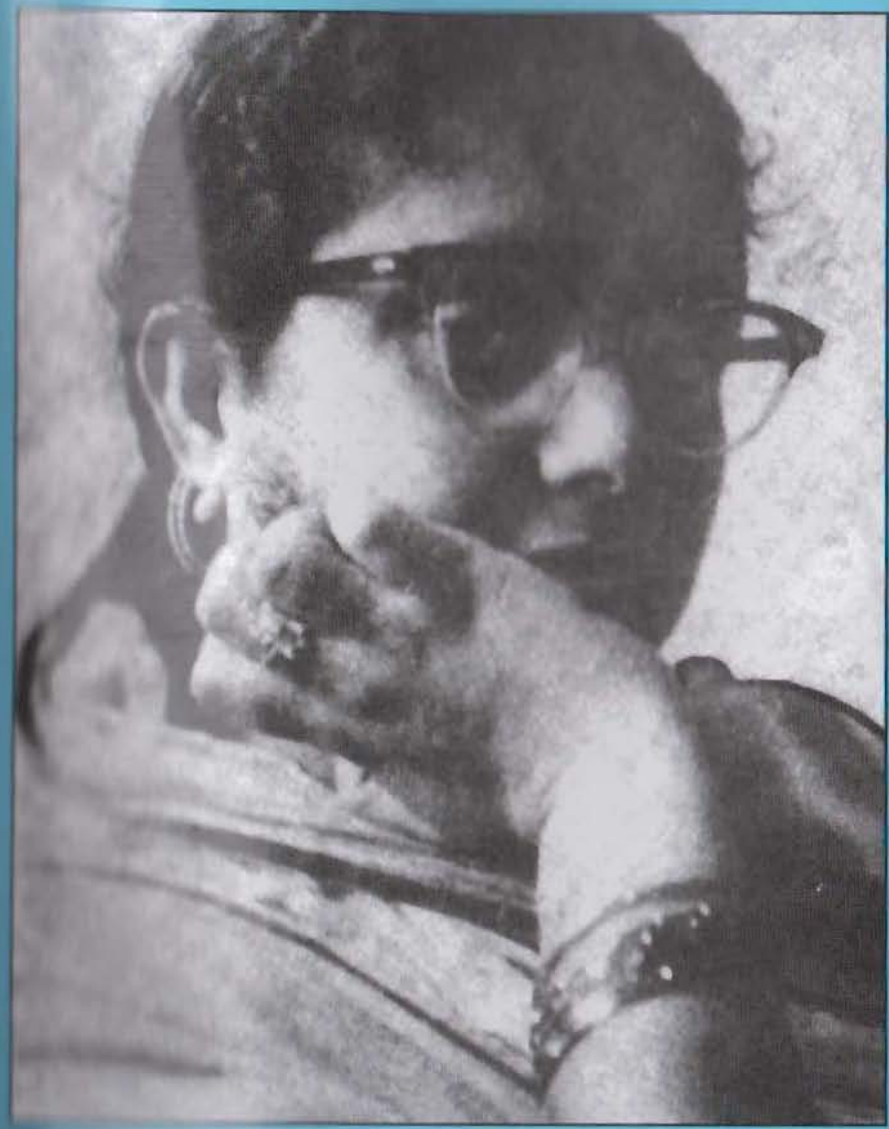

# বেগম কমর মুশতারী আহসান স্মরণে

# বেগম কমর মুশতারী আহসান স্মরণে

মাহমুদ শাহ কোরেশী
সম্পাদিত

সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি সংসদ

প্রকাশক :
সৈয়দা কমর জাবীন
সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি সংসদ
'আশায় বসতি'
৬০/২ উত্তর ধানমন্ডি
কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশকাল :
জুলাই, ২০১৬

মুদ্রণ :
গণমুদ্রণ লিমিটেড
পোঃ মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট
ঢাকা-১৩৪৪

# সূচিপত্র

ক. সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি সংসদ
খ. সৈয়দা কমর জাবীন : পূর্বকথা

- সৈয়দ আলী আহসান : কবিতা
- সৈয়দ আলী আহসান : আমার স্ত্রী
- জাহানারা আরজু : আমার কথা
- ফজলে রাব্বি : বড় মামানী
- সারফুন নেসা বেগম (আজু) : আমার কাছে বড় মামানী
- রহিমা করিম : মামানীর কিছু স্মৃতি
- মোকাররম হোসেন তৌহিদ : আমার জীবনে প্রথম মামী
- সৈয়দ ইজাজ আহমাদ রুমী : বড় মামানী
- সৈয়দ ইহসান আহমদ রুমী (লাবিব) : মামানীকে স্মরণ
- সৈয়দ মোহাম্মদ সাবের (তুলি) : আমাদের বড় মামানী
- সালমা বানু পলা (টুকটুক) : মিনা আপার কথা
- সানজিদা জামান খান : আমার ফুফু
- নুসরাত কমর চৌধুরী (প্রসন্না) : আপুমণি
- রীতা মেহরাব : আমার অনেক কাছের শাশুড়ি-মা
- সৈয়দ আলীউল আমীন (সিমাব) : আম্মার স্পর্শ
- সৈয়দা কমর জাবীন : মা-মণির কিছু কথা
- মাহমুদ শাহ কোরেশী : মানিকগঞ্জের মেয়ে – আমাদের 'মা-মণি'
- আবদুল মান্নান : শেষ কথা : আপন যে জন
- সৈয়দা তাসনিমা রেজা : বড় চাচীর স্মৃতি
- মা-মণির একটি গল্প – বন্ধন
- মা-মণির ৪টি চিঠি
- কথাশিল্পী দিলারা হাশেমের চিঠি
- কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার কমিটি ও পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব
- আলোকচিত্রে বিরাজমান তিনি

Syed Ali Ahsan Study Centre
সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি সংসদ

Patron : Khan Mohd. Ameer
Advisors : Poet Zahanara Arzoo
Mr. Fazle Rabbi

President : Professor Mahmud Shah Qureshi
Vice-President : Professor Monsur Musa
Treasurer : Syeda Quamer Jabeen
Secretary : Professor Sardar Abdus Sattar


# পূর্বকথা

আমার স্বামী ড. কোরেশী আমাদের মা-মণির ওপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। তাঁর ইচ্ছা সেটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা। এতদসঙ্গে একদা আমার আব্বা অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান মা-মণির নামে যে পুরস্কার কমিটি করেছিলেন তার কিছু পরিচিতি, কয়েকটি আলোকচিত্র, মা-মণির একটি গল্প ও কয়েকটি পত্র ছাপিয়ে দিলাম।

তাছাড়া রফিক ভাই ওরফে জনাব ফজলে রাব্বি, আজু আপা, রহিমা আপা, তৌহিদ ভাই, বোন সাঞ্জু, ভাই তুলি ও সিমাব ওরফে সৈয়দ আলী-উল আমীন এবং আমার একটি স্মৃতিচিত্র সংযোজিত করা হলো। ভ্রাতৃবধূ রীতা, দুই ফুফাতো ভাই ইজাজ ও ইহ্সান, টুকটুক খালা এবং আমাদের একমাত্র মেয়ে প্রসন্নাও এর মধ্যে কিছু লিখে ফেললো। আমাদের মান্নান ভাই, মেহেরপুরের সাবেক এম.পি শেষ মুহূর্তে তাঁর সশ্রদ্ধ স্মৃতি নিবেদন করলেন। আরো কেউ কেউ লিখবেন – এই ছিল প্রত্যাশা এবং এর জন্য প্রকাশনায় বিলম্ব ঘটলো। অন্তত একজন, সৈয়দা তাসনিমা রেজা ওরফে লাইনো কথা রাখলো।

আশা করি, উত্তরসূরী ও অনুরাগী মহল সাদরে গ্রহণ করবেন এবং মা-মণির জন্য দোয়া করবেন।

সৈয়দা কমর জাবীন
'সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি সংসদ'-এর পক্ষে

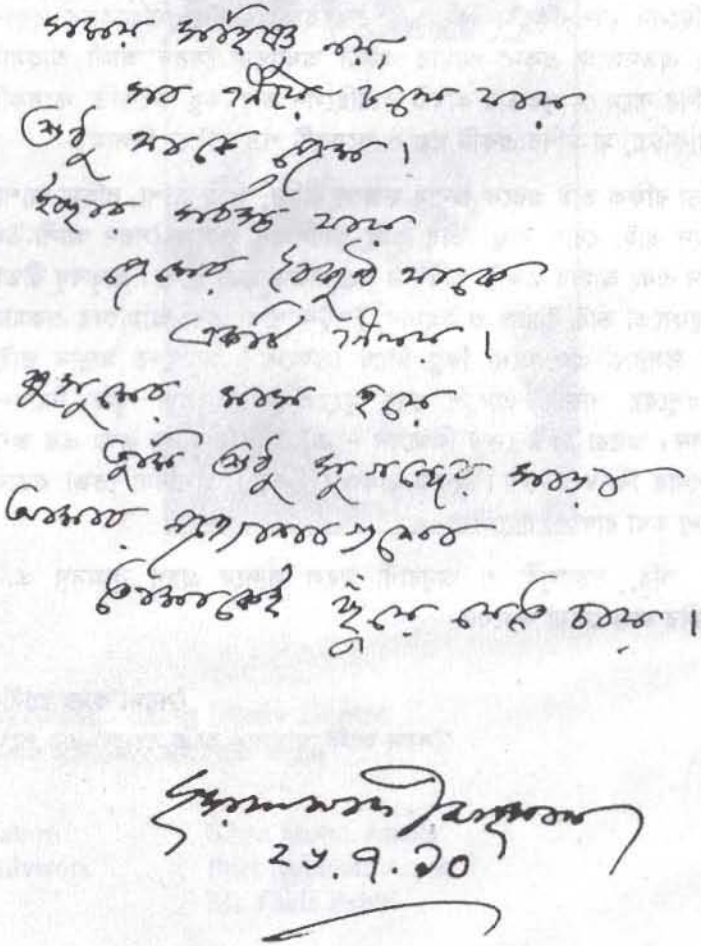



# আমার স্ত্রী

১৯৮৩ সালে ১৭ জানুয়ারি আমার স্ত্রী কমর মুশতারীর মৃত্যু হয়। জীবিতকালে তিনি সংসার জীবনের বাইরে সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মমতার বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অধিগম্যতা ছিল এবং তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে তিনি আমার সঙ্গিনী হয়েছিলেন। এছাড়াও আমার সঙ্গে ভারত ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন বিভিন্ন সময়ে।

আমার স্ত্রী কমর মুশতারীকে স্মরণ করে আমি পুরস্কার প্রবর্তন করেছি। সে পুরস্কার 'কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের খ্যাতনামা সকল মহিলা সাহিত্যিক এ পুরস্কারে ভূষিত হয়ে আসছেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। যাঁরা এই পুরস্কারে ভূষিত হতে পেরেছেন, তাঁদের কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁদের সাহিত্যের পরিধি ব্যাপকতা পাক ও দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হোক – এই দোয়া রইল।

সৈয়দ আলী আহসান
২০০১

# আমার কথা

কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান শুরু হয়েছে আজ থেকে এক যুগেরও ওপরে। এই পুরস্কারের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যে মহিলাদের অবদান যে কোন অংশেই নগণ্য নয় – এ স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। এই পুরস্কার শুধুমাত্র মহিলা লেখিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তার প্রধান কারণ এখনো আমাদের মহিলা লেখিকারা যথেষ্ট ভাল লিখেও যথাসময়ে সঠিক মূল্যায়নে যথাযোগ্য সম্মানে সমাদৃত হন না। সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার্য, আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের উদারতার অভাব মেয়েদের কর্মজীবনে ও সাহিত্য জীবনে একটি ব্যবধান রেখা টেনে দিয়েছে। এ কথা মেনে নিয়েই কমর মুশতারী মেয়েদের কথা ভেবেছিলেন।

কমর মুশতারী ব্যক্তিগত জীবনে একজন সুগৃহিণী ও সুলেখিকা ছিলেন। যদিও তিনি প্রচুরভাবে লিখে যেতে পারেন নি। ষাটের দশকে লেখা তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ আমরা পেয়েছি। তাঁর এই স্বল্পকালীন সময়ের লেখা গল্প নিটোল এবং পরিণত জীবনবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন, বিশেষ করে নারীজীবনের ব্যাকুলতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমানের সুকোমল অনুভূতি দানা বেঁধে উঠেছে। একটি সম্ভাবনাময় লেখিকা হারিয়ে গিয়েছেন সবার চোখের আড়ালে।

তাঁর পবিত্র স্মৃতিকে স্মরণ রেখে তাঁর স্বামী সর্বজনশ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান 'কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এই পুরস্কার প্রদান প্রথম দিকে শুধুমাত্র মহিলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে এর পরিধি বেড়েছে। কবিতা, প্রবন্ধ, সম্পাদনা এসব সাহিত্য-অনুষঙ্গ সংযোজিত হয়েছে।



যাঁরা এই পুরস্কারে এ যাবৎ পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় আমার শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান এই পুরস্কার কমিটির সভাপতির দায়িত্বভার আমাকে দিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ ও গর্বিত।

আমি একসময়ে কমর মুশতারীর স্নেহসান্নিধ্য পেয়েছিলাম। এখনো তাঁর স্মৃতির বন্ধনে আমি আবদ্ধ।

জাহানারা আরজু
সভাপতি
কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার কমিটি

# বড় মামানী

## ফজলে রাব্বি

কমর মুশতারী আহসান আমার বড় মামানী। আমার বড় মামা সৈয়দ আলী আহসানের স্ত্রী। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে অনেক কথা বলা যায়। কারণ তাঁর সৈয়দ পরিবারে পুত্রবধূ হয়ে আসার প্রথম দিন থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিলাম। মামা-ভাগনের সম্পর্ক এক অসাধারণ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সম্পর্কে প্রথমে মনে পড়ে আমার মার পূর্বপুরুষ হযরত শাহ আলী বোগদাদী ও তাঁর ভাগনে শাহ ওসমানের কথা। মামা ও ভাগনে এক সাথে সুদূর বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলায় এসেছিলেন।

আজকের আলোচ্য অবশ্য বড় মামা নন। তাঁর স্ত্রী কমর মুশতারী আহসান। তাঁদের বিয়ের সম্পর্ক বা ঘটকালী করেছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী। মামা তখন কলকাতা রেডিওতে চাকরিরত। জহুর হোসেন তাঁকে হাওড়া জেলার বাউরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কামরুজ্জামান খানের কন্যাকে দেখাতে নিয়ে গেলেন। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দেখেই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

১৯৪৬ সাল। কলকাতার দাঙ্গা সবে শেষ হয়েছে। আমরা তখন বাগেরহাটে। বিয়ের তারিখ ঠিক হবার খবর এলো। ঠিক হলো, আমি ও আমার ছোটভাই শফিক বাবার সাথে খুলনা থেকে ট্রেনে কলকাতা হয়ে বাউরিয়ায় বিয়েবাড়িতে বরযাত্রীর সাথে মিলিত হব। মূল বরযাত্রী আমার নানাজানের সঙ্গে ঢাকা থেকে গোয়ালন্দ হয়ে ট্রেনে কলকাতা হয়ে বাউরিয়ায় আসবে। তাই হলো। অনুষ্ঠানের পর আমরা সকলে নতুন বৌ নিয়ে ট্রেনে কোলকাতা থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে ঢাকায় ফিরলাম।

সেই যে বড় মামানীর সাথে চলতে আরম্ভ করলাম তা আর ক্ষান্ত হয়নি। তিনি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেদিনও আমি এবং আমার স্ত্রী ডলি তাঁর পাশে ছিলাম। ঘটনাচক্রে বা ভাগ্যক্রমে কখনো আমার ইচ্ছায় আবার কখনো বড় মামার ও মামানীর ইচ্ছায় আমরা পরস্পরের অতি নিকটে চলে এসেছি। যা আমার আর কোন ভাইবোনের সাথে হয়নি।



তেমনি আর কোন ভাগিনা-ভাগনির সাথে তাঁদেরও এমন সম্পর্ক হয় নি। এই কারণে আমি তাদের দু'জনকে যেভাবে জেনেছি তা আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

আমার এক বন্ধু মামানী সম্পর্কে বলেছিল যে, তিনি নাকি হিন্দুদের মা দুর্গার মতো। মামানী যখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী তখন থেকেই তাঁর ছোটগল্প লেখার অভ্যাস ছিল। তাঁর অন্তরের গভীরে একটা গোপন আশা ছিল যে আকাশছোঁয়া মেধাবী কবি ও সাহিত্যিক স্বামী সৈয়দ আলী আহসানের সংস্পর্শে ও সহায়তায় তিনিও বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে স্থান করে নেবেন ও সুখ্যাতি লাভ করবেন। কিন্তু সহায়তা লাভের পরিবর্তে স্বামী ও সন্তানদেরকে তাদের কাজে সহায়তা দিতে দিতে সময় যে কখন শেষ হয়ে এসেছিল তা কেউ বুঝতে পারে নি। তবু মামানীর প্রথম জীবনে রচিত গল্পগুলির একটি সংকলন গ্রন্থ মামা উদ্যোগ নিয়ে প্রকাশ করিয়েছিলেন মামানীর মৃত্যুর কিছু পূর্বে। মামানীর মৃত্যুও হয়েছিল অকালে। স্ত্রীর প্রতি সৈয়দ আলী আহসানের অফুরন্ত ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে সৈয়দ আলী আহসান প্রবর্তন করেছিলেন কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার। পুরস্কার প্রদান কমিটির সদস্য করেছিলেন পরিবারের অপর সদস্যদের সঙ্গে আমাকে ও আমার স্ত্রী গুলশান আরাকে।

মামানীর বাবা কামরুজ্জামান খান ইংরেজ আমলের শেষ দিকে অধিকাংশ সময় হাওড়া জেলার হিন্দু-প্রধান এলাকার বিভিন্ন থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। স্বভাবত শিক্ষিত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের সাথে মামানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল। এককথায় বলা চলে তাঁদের পরিবেশ ছিল হিন্দু পরিবেশ। বিয়ের পর তিনি এসে পড়লেন ভীষণ গোঁড়া মুসলমান সৈয়দ পরিবারে। এই পরিবারের সকলের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য তিনি যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা অতুলনীয়। মামুর তরফ থেকে তেমন কোন চাপ বা চাহিদা ছিল না। যে মেয়ে কখনো মাথায় ঘোমটা দেয় নি সেই তিনি বোরখা পরতে আরম্ভ করলেন। নামাজ-রোজাতে গাফিলতি হলো না। বরং নানা বাড়ির ধারাবাহিকতায় তিনি পীর সাহেব জনাব গোলাম মোকতাদিরের নিকট মুরিদ হলেন। পীর সাহেব যে সকল ওজিফা পড়তে বলেছিলেন মামানী সারা জীবন সেই সব ওজিফা নিয়মিত পাঠ করেছেন। বিয়েতে মামানীর বাবা তাঁকে বেশ কিছু সোনার গহনা দিয়েছিলেন আর মামুকে দিয়েছিলেন সোনার পার্কার কলম ও সোনার দামি হাতঘড়ি। মামানীর ধারণা হয়েছিল যে, এগুলি ঘুষের টাকায় কেনা। বিয়ের

কয়েক বছর পর এইসব জিনিস তিনি ফেলে দিতে লাগলেন। তখন অনেকেই সেগুলি কুড়িয়ে নিয়েছিল। আমার ছোটভাই শফিক পেয়েছিল সোনার হাতঘড়ি। সেই সুন্দর হাতঘড়িটা একদিন আমি শফিকের কাছ থেকে নিয়ে হাতে দিলাম। হাতে দিয়ে বাসে করে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় এলাম। গুলিস্তান থেকে বাসে হোসেনি দালান আসার সময় ইউনিভার্সিটির মোড়ে বাস থেকে নামার পর মনে হলো হাতে ঘড়ি নেই। সত্যি নেই। তখন সন্ধ্যা। বাসায় গিয়ে হারিকান এনে যেখানে বাস থেকে নেমেছিলাম সেই জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। ঘড়ি পেলাম না। নানাকে গিয়ে বললাম। নানা বললেন 'ইন্নলিল্লাহে ওয়াইন্না এলাইহে রাজেউন' একলাখ বার পড়, ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবে। তাই পড়তে আরম্ভ করলাম। দুই বা তিনদিন পর এক লাখবার তসবিহ পড়ার পর খবরের কাগজে দেখলাম হারানো-প্রাপ্তি বিজ্ঞাপন। মটর ভেহিকল এসোসিয়েশন জানিয়েছে, একটি ঘড়ি পাওয়া গিয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে আহসান মঞ্জিলে অবস্থিত তাদের অফিস থেকে ঘড়ি নিয়ে যেতে বলেছে। প্রমাণ কী? বড়মামার নিকট গিয়ে সব খুলে বললাম। তিনি খুঁজে একটা পুরাতন ডাইরি পেলেন। সেখানে ঘড়ির নাম ও নম্বর লেখা ছিল। তাই নিয়ে আহসান মঞ্জিলে এসোসিয়েশন অফিসে ঘড়ির নাম বলতেই তারা ঘড়ি এনে দিল। এটি প্রায় অলৌকিক একটি ঘটনা। বিষয়টি রহস্যময়।

সততা, হারাম, হালাল ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি মামানীর আনুগত্যের তুলনা হয় না। বাবার দেওয়া মূল্যবান উপহার তিনি অবলীলায় ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ তার সন্দেহ হয়েছিল যে সেই সকল মূল্যবান সামগ্রী হয়তো হারাম অর্থে কেনা। অন্যদিকে সেই হারিয়ে যাওয়া হাতঘড়ি আমি ফিরে পেলাম অলৌকিক ভাবে।

বড় মামা যখন জিয়াউর রহমানের মন্ত্রীত্ব নিয়েছিলেন মামানী সেটা পছন্দ করেন নি। তিনি ভয় করতেন যে, সৈয়দ আলী আহসানের অসাধারণ মেধাকে কেউ অপব্যবহার করতে পারে। মামানী সেই ভয়ে সব সময় শঙ্কিত থাকতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাগতিক চাকচিক্য ও মোহের প্রতি সৈয়দ আলী আহসানের কিছুটা আকর্ষণ বা দুর্বলতা আছে। সেই মোহ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে হবে কীভাবে, কমর মুশতারী আহসান তা জানতেন। দরদ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে তিনি সৈয়দ আলী আহসানকে সর্বক্ষণ আগলে রাখতে চেষ্টা করেছেন। সে কারণে সৈয়দ আলী আহসান হতে পেরেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান।



# আমার কাছে বড় মামানী

## সারফুন নেসা বেগম (আজু)

আমার লেখার অভ্যাস একেবারেই নেই। থাকবেই বা কেমন করে। চিঠি লেখার পাট তো একেবারেই উঠে গেছে। তাছাড়া আমি কোন কিছু লিখবো – এটা ভাবতেই পারি না। কারণ আমার ভালো লাগে সব রকমের সেলাই, রান্না আর বই পড়তে। সিয়াটল থেকে যখনই ঢাকায় আসি সবসময় শীতেই আসা হয়। এবারই এলাম শীতের শেষে। ২০১৬ সালের জানুয়ারির একেবারে শেষে। ফেরত যাব জুন মাসের মাঝামাঝি। আত্মীয়-স্বজন সবাই খুশি যে এবার অনেকদিন থাকছি।

এখানে এসে রহিমাকেও পেলাম। আসার সাথে সাথেই অনেক দাওয়াত ও অনেক ঘোরাঘুরিও হলো। কয়েকদিন পর বড়মামুর ছোট মেয়ে নাচ্ছু (নাসরীন) ফোন করে জানালো – বড় মামানীর ওপর কিছু লিখতে। বড় মামানীকে আমরা কে কতটুকু দেখেছি বা জেনেছি সেটাই লিখে একটা বই প্রকাশ করা হবে।

আমি বড় মামানীর বিয়ে দেখেছি। বেশ অনেক ঘটনাই মনে আছে। আম্মা আমাদের সবাইকে নিয়ে বড়মামুর বিয়ে উপলক্ষে ঢাকা গেলেন। বড়মামু তখন কোলকাতায় রেডিওতে চাকুরী করতেন। কোলকাতা থেকেই বড়মামু বাউরিয়াতে যান বিয়ে করতে। আর ঢাকা থেকে নানা, মেজমামু, সেজমামু এবং আরো অনেকে কোলকাতায় বড়মামুর সাথে যোগদান করেন। অনেক দূরের রাস্তা বলে কোন মহিলা বরযাত্রী যায় নি।

সেকালে রেওয়াজ ছিল শাশুড়ির বিয়ের শাড়ি প্রথমে বৌকে দেওয়া। যতদূর জানি নানী তাঁর বিয়ের শাড়ি পাঠিয়েছিলেন বড় মামানীর জন্য।

ছোটবেলা থেকেই আমার নতুন বৌ দেখার ভীষণ আগ্রহ ছিল। ঢাকায় হোসেনী দালানে নানীর বাসায় আমরা সবাই মানে আম্মা, খালারা, হেলেন এবং আরো অনেকে রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছি নতুন বৌকে দেখার জন্য। সবকিছু ভাল করে মনেও নেই এখন।

বড় মামানী দেখতে কেমন ছিলেন – সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস।

তোমরা কি কেউ 'ক্ষীরের পুতুল' নামে রাজা-রানীর গল্পের বই পড়েছো? বইটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছোটদের জন্য। রাজা ও দুয়োরানী সুয়োরানীর গল্প। রানীর ছেলের বৌ হলো ক্ষীরের পুতুল। ক্ষীরের পুতুল বৌ অবশ্য বদলে গিয়ে ছোট্ট এক অপরূপ রাজকন্যায় পরিণত হয়। বড় মামানীকে প্রথম যখন দেখলাম তখন ক্ষীরের পুতুল বৌয়ের কথাই আমার মনে হয়েছিল। জানতাম, বৌ কখন আসবে। সময়টা মনে নেই। তবে দিনের বেলা। ঘোড়ার গাড়িতে করে বড়মামু মামানীকে নিয়ে হোসেনী দালানের বড় দরজায় এসে নামলেন। আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখলাম – ক্ষীরের পুতুলের মতো দেখতে একটি পুতুল সোনালী রঙের শাড়িতে জড়ানো আর সোনার গহনা পরে চোখ বন্ধ করে এক কোণে বসে আছে। সেই মুহূর্তে মামানীকে সত্যিই আমার কাছে মনে হচ্ছিল কি মিষ্টি মুখের একটা সোনার পুতুল। তারপর মামানীকে কে বা কারা গাড়ি থেকে নামালো সে সমস্ত কথা কিছু মনে নেই। সারাক্ষণ মামানীর আশেপাশেই ঘুরতাম। মামানীর গায়ের রঙ ছিল পাকা সোনার মতো। নানী বলতেন গঞ্জবী রঙ। পরে নবাববাড়িতে শুনেছি তারা বলে 'গোহাক্যা' রঙ। মামানীর কপালের জড়ুলটা আমার কাছে সিঁথি মৌর থেকেও ভাল লাগতো।

তারপর ওয়ালিমার দিন সবাই বৌ দেখা নিয়ে কী ব্যস্ত! সেদিন আবার মেঘলা ছিল। সিদ্দিকা খালা টর্চলাইট জ্বালিয়ে সবাইকে বৌয়ের মুখ দেখাচ্ছিলেন এবং সেই সঙ্গে মামানীর গহনা, জড়োয়ার নেকলেস মামানীর গলায় কী যে মানিয়েছিল তা আমি তোমাদের কাউকে লিখে বুঝাতে পারবো না।

মামানীর অনেক গহনা ছিল। আমরা সেগুলো শুধু চোখ দিয়ে নয়, একেবারে মনপ্রাণ দিয়ে দেখতাম। কয়েকদিন পরই মামু ও মামানী ফিরে গেলেন বাউড়িয়াতে। মামানী তো খুব খুশি যে তিনি বাপের বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন কিন্তু খুশি হতে পারছেন না বড়মামুর জন্য। ব্যাপারটা খুলেই লিখি। নানী আর বড়মামু দু'জনে খুব ক্লোজ ছিলেন। এমন নয় যে নানী অন্য ছেলেমেয়েকে কম ভালবাসতেন। বড়মামু কোলকাতায় চাকুরী করতেন এবং সেখান থেকে বিয়ে করতে চলে গিয়েছিলেন বাউড়িয়াতে। অনেকদিন নানীর সঙ্গে দেখা হয়নি। আর নতুন বৌ নিয়ে ঢাকায় এসে নানীর সাথে তিনদিনের বেশি থাকতে পারেননি। সত্যি, কিন্তু বড়মামু বৌ নিয়ে ফিরে



যাওয়ার সময় কাঁদছিলেন এবং সেই সঙ্গে নানীও। মামানী পরে আমাদের কাছে গল্প করেছেন – 'তোমার মামার কান্না দেখে আমিও কাঁদতে শুরু করেছিলাম। জানি, এখন এই গল্প শুনলে সবাই হাসবে। তারপর আমরা ফিরে গেলাম সাতক্ষীরায় না বাগেরহাটে কোথায় যেন।

বয়সের বেশ তফাৎ থাকা সত্ত্বেও আমি, কুটিখালা ও হেলেন আমাদের কারো সঙ্গেই মামানী খুব একটা গুরুজন ভাব রাখেন নি। মামানীকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম কিন্তু ভয় করতাম না। যেমন মেজমামানীকে খুব ভয় করতাম (মেজমামী হলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফের স্ত্রী। তিনি আরবিতে মাস্টার্স ডিগ্রীধারী)। সিদ্দিকা খালার সঙ্গে মামানীর সবচেয়ে বেশি সখ্যতা ছিল।

আমরা সবসময়ই চাইতাম মামানী যেন সর্বক্ষণ সেজেগুঁজে থাকেন। সিদ্দিকা খালার বিয়ের কয়েক দিন পরে আমরা সবাই মিলে খালাকে আনতে গেলাম তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে (ফিরা-উল্ট)। তখন বড় মামানী খুব একটা দামী শাড়ি পারেন নি। আমি বলেছিলাম মামানীকে আরো জমকালো শাড়ি পরতে। মামানী বলেছিলেন – 'সেটা ভাল দেখায় না। কারণ দেখছো না? আছিয়া যেখানে খুবই সাধারণ শাড়ি পরেছে, সেখানে আমি বেশি দামী বা জমকালো শাড়ি পরতে পারি না।' উঁহু, আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা তিনজনই মামানীর সাথে খুব সহজভাবে গল্পগুজব করতাম। আমরা বেশি কথা বলতাম না।

বড়মামু যখন গোপীবাগের বাসায় ছিলেন, আমি আর কুটিখালা বেশ কয়েকদিনের জন্য সেখানে ছিলাম। যাওয়ার দু'দিন পরেই ছিল পহেলা এপ্রিল। মামানী আমাকে ডেকে বললেন – 'আজু, যাও তোমার নানীকে (মানে মামানীর মা) এপ্রিল ফুল করে এসো।'

হোসেনী দালান থেকে বেশ কিছু নাস্তা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মামানী একটা প্লেটে বেশ কিছু নারকেলের ছোবা নিয়ে বেশ করে খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে আমার হাতে দিয়ে বললেন – 'যাও, তোমার নানীকে দিয়ে এসো।' তখন সকাল ৮টা বাজে। নানী রান্নাঘরের বারান্দায় বসে সকালের নাস্তার যোগাড় করছিলেন। মামানীর মা একেবারে পাশের বাড়িতেই থাকতেন। মামানীর খাবার ঘরের জানালা দিয়ে নানীর বাসার সবকিছু দেখা যেতো এবং শোনাও যেতো। আমি বেশ সাবধানে প্লেটের প্যাকেটটা নিয়ে নানীর বাসায় গিয়ে বললাম, 'নানী, বড় মামানী পিঠে আর ক্ষীর দিয়েছেন আপনাদের জন্য।' আসলে এগুলো মেজমামানীর বাপের বাড়ি থেকে

এসেছে। নানী হাসিমুখে বললেন, 'ও আচ্ছা, ওখানে নামিয়ে রেখে যাও। আমি একটু পরেই দেখছি।' আমিও আস্তে করে প্লেটটা নামিয়ে রেখে চলে এলাম। আসার একটু পরেই শুনলাম নানীর চিৎকার – 'ও মিনা, তোর ভাগ্নি আমাকে ভালই এপ্রিল ফুল করলো।' মামানী তো হেসেই অস্থির।

মনে পড়ে রাতে খাবার টেবিলে বসে মামানী এবং আমরা অনেকে গল্পগুজব করতাম। খুব হাসির পালা চলতো। আমি আর কুটিখালা বড়মামুর সামনে বসে মন খুলে হাসতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মামানীর হাসি দেখে আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারিনি। মামানীর কথা শুনে বড়মামুরও হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু তিনি মুখ বন্ধ করে হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করার দরুন মামার নাকের পাটা দুটো ক্রমাগত ফুলে উঠছিল। আর তাই দেখে মামানী হেসে লুটিয়ে পড়ছিলেন। মামানীর সেই হাস্যোজ্জ্বল মিষ্টি মুখখানি এখনও আমার মনে ছবি হয়ে আছে।

মামানীকে আমি অবশ্য খুব বেশিদিন পাই নি। আমার বিয়ের বেশ অনেক আগেই মামু করাচী ইউনিভার্সিটিতে চাকুরী নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য আমার বিয়ের কিছুদিন পরেই আবার ঢাকায় ফিরে আসেন। আমার শ্বশুরবাড়ির কাছেই আগামসিহ লেনে বেশ একটা বড় বাসায় অনেক দিন ছিলেন। বড়মামু তখন বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর।

আমি তখন আমার শ্বশুরবাড়ি কায়েতটুলী থাকি। মামানী আমাকে ও আমার স্বামীকে প্রায় দাওয়াত করে খাওয়াতেন। তবে মামানীকে আমার বিয়ের আগে যেভাবে পেয়েছি, সেভাবে আমি আর তাঁকে পাই নি।

বড় মামানীর কথা মনে পড়লেই আমার সেই দুয়োরানীর ক্ষীরের পুতুল বৌয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

আরো অনেক মধুর স্মৃতি আছে বড় মামানীকে নিয়ে। সেসব কথা অন্য সময় বলতে বা অন্য কোথাও লিখে রাখতে চেষ্টা করবো।



# মামানীর কিছু স্মৃতি

রহিমা করিম

কমর মুশতারী (মিসেস সৈয়দ আলী আহসান) আমার বড় মামানী। অনেক বছর হলো তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তবে আমার স্মৃতিতে তিনি এখনো বেঁচে আছেন।

মামানীকে প্রথম দেখার ঘটনাটি খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে আমার। তখন আমার বয়স মাত্র চার বছর। ১৩ নম্বর হোসেনী দালান রোডে নানার বাড়ির ফটকের কাছে আরও অনেকের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। ফটকের সামনে রাস্তার ওপর ঘোড়ার গাড়ি এসে থেমেছে। বড় মামু ভেতরে নববধূ নিয়ে বসা। আমি দৌড়ে গেলাম নতুন বউ দেখার জন্য। বড় মামুর মাথায় পাগড়ি, ঘোমটা মাথায় মামানী পাশে। খুব সুন্দর মিষ্টি হাসি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখছেন। তবে সেখানে আমার সঙ্গে আর কারা ছিল, কখন নতুন বর-বধূকে নামানো হলো সেসবের কিছু আমার মনে নেই।

অনেকদিন পর কথা প্রসঙ্গে বড় মামানীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঐ দিনটির কথা। মামানী বলেছিলেন, "ঘোড়ার গাড়ির ভেতরে বসেই দেখতে পেলাম, সবুজ ফ্রক পরা মাথায় ছোট ছোট চুল নিয়ে গোলগাল একটা মেয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ মেয়েটি কে? তোমার মামা বলল, আমার বড় বোনের মেয়ে।"

তারপর মামানীকে দেখেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায়। হোসেনী দালান রোডের বাড়িতেই প্রথম কিছুদিন ছিলেন যেটাকে আমার সবসময় 'হোসেনী দালান' বলতাম। পুরান ঢাকার এই রাস্তার ওপরই রয়েছে শিয়াদের বিখ্যাত ইমামবাড়া যা হোসেনী দালান হিসেবে পরিচিত। এই রাস্তা ধরে নানার বাড়িটা হাতের বাঁয়ে রেখে সামান্য এগিয়ে গেলেই দেখা মেলে সেই ইমামবাড়ার।

গোপীবাগে মামানীর সাজানো-গোছান সুন্দর ছোট্ট সংসার দেখেছি আমি। তিনি খুব নিয়ম মেনে চলতেন। তাঁর সুন্দর মনের পরিচয় পেয়েছি

যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমি ভূগোল বিভাগের ছাত্রী। শেষ দুই বছর বড় মামুর বাসায় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত ও পড়ালেখা করেছি। ওই দিনগুলোয় মামানী যেমন তাঁর নিজের মেয়ে জিনাত ও নাসরীনের খেয়াল রাখতেন, তেমনি আমার প্রতিও খেয়াল রাখতেন। ভার্সিটির ক্লাসে যাওয়ার আগে খেয়েছি কিনা, ফিরেও ঠিকমতো খেলাম কিনা, তা সবসময় খেয়াল করতেন। মামানীর কিছু সুন্দর নিয়ম ছিল। আর তিনি চাইতেন, সবাই যেন নিয়মগুলো মেনে চলে।

মামানী খুব ভোরে সবাইকে ডেকে দিতেন যেন ফজরের নামাজ কাজা না হয়। ঝি-চাকরদের উঠতো হতো খাবার তৈরি করার জন্য। সকাল আটটার আগেই আমাদের নাস্তা খাওয়া শেষ। তবে স্কুল-কলেজ খোলা থাকলে এ রকম, আর ছুটির দিনে একটু অন্যরকম ব্যবস্থা হতো। সকাল আটটার মধ্যে নাস্তা শেষ হতো বটে, তবে বেলা ১১টার দিকে মামানী সামান্য কিছু খাবারের আয়োজন করতেন। কখনো বাইরে থেকে গরম ডালপুরী, সিঙ্গারা বা ঝালমুড়ি-চানাচুর কিনে আনাতেন। আবার দুপুর একটা থেকে দুটার মধ্যে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতো। এরপর ঘরের জানালার পর্দাগুলো টেনে দিয়ে সকলকে বিশ্রাম নিতে বলে চলে যেতেন।

অবশ্য মামানী চলে গেলে আমি, জিনাত ও নাসরীন মিলে গল্পে মেতে উঠতাম বিছানায় না গিয়ে। আস্তে করে ড্রইং রুমে চলে যেতাম তিনজন। কখনো সেখানে আমার ছোট বোন নাজমাও থাকতো।

মামানী চারটার সময় উঠে পড়তেন। আছরের নামাজের পর পাটভাঙ্গা শাড়ি পরে বারান্দায় বসতেন। সেখানে বিকেলের চা খাওয়া হতো সবার।

তখনকার দিনে প্রায় বিকেল বা সন্ধ্যায় একে অপরের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার প্রথা ছিল। বড়মামুর বাসায় প্রায়ই তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন চলে আসতেন। মামানী তাই বলতেন যে কখন কে আসবে বলা যায় না। আর তাই বাড়ি-ঘর সবসময় পরিষ্কার রাখা উচিত। আমাদেরকেও বলতেন যেন বিকেল হলেই ঘরের কাপড় পাল্টে ভাল কাপড় পরে নেই।

মামানীর এই গুণগুলো আমার খুব ভাল লাগতো। তিনি কোমল স্বভাবের ছিলেন। সবসময় সবাইকে হাসিমুখে আপ্যায়ন করতেন। কলকাতার নামকরা অভিনেত্রী সন্ধ্যা রানীর সঙ্গে বড় মামানীর মিল দেখতে পেতাম। বিশেষ করে তাঁর মুচকি হাসি।



আমেরিকায় বড় মেয়ে জিনাতের বাসায় যখন বড়মামু ও মামানী বেড়াতে এসেছিলেন, তখন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল নিউ জার্সিতে আমার বাড়িতে তাঁদেরকে এনে দু'দিন রাখার।

মামানী ছিলেন বুদ্ধিমতী, সহনশীলা ও পয়মন্ত নারী। প্রয়াত ব্যক্তিকে যখন স্মরণ করি, মন আমাদের তখন আবেগ প্রবণ হয়ে ওঠে।

কিছুদিন আগে বড়ভাই (ফজলে রাব্বি) আমাকে বললেন, "কোরেশী (ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, নাসরিনের স্বামী) ও নাচ্ছু (নাসরিনের ডাক নাম) মিলে বড় মামানীর স্মৃতিকথা প্রকাশ করবে। তুইতো মামানীর কাছে কিছুদিন ছিলি। সময় করে একটা লেখা পাঠিয়ে দে।"

এখন স্মৃতিশক্তি অতো প্রখর নয়। তবু পেছনে তাকিয়ে ঝাপসা যে টুকরো ছবিগুলো পেলাম, তা থেকেই সামান্য তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। প্রয়াত ব্যক্তিদের যখন স্মরণ করি তখন আমরা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠি। অনেকদিন হলো, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর অনেক স্মৃতি আমার মনের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

# আমার জীবনে প্রথম মামী

## মোকাররম হোসেন তৌহিদ

'মামী এলো লাঠি নিয়ে পালাই পালাই' – এ ছড়ার অর্থ নিয়ে শৈশব থেকে আমার মনে দ্বন্দ্ব ছিল। আমার জীবনে প্রথম মামী হলেন আমার 'বড় মামানী', যাঁকে আমার মা সারা জীবন 'আহসানের বৌ' বলে ডেকে এসেছেন। সেই বড় মামানী ছোটবেলা থেকে তাঁর স্নেহ-মমতা আর ভালবাসা দিয়ে আমাকে আষ্টে-পিষ্ঠে বেঁধে রেখেছিলেন এবং সেটা তাঁর পুত্র-কন্যার প্রতি ভালবাসার চেয়ে যে একবিন্দুও কম ছিল না তার প্রমাণ আমি যাপিত জীবনে প্রতিনিয়ত পেয়েছি। বিশেষ করে পেয়েছি যখন আমি কলকাতার গোবরা রোডের ভাড়া বাড়িতে সৈয়দ আলী আহসানের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে শরণার্থীর দীর্ঘ পাঁচটি মাস কাটিয়েছি। তাঁর আশ্রয়ে থাকার কারণে ঘরবাড়ি, আপনজন ছেড়ে আসার কোন কষ্টই আমাকে পেতে হয়নি। বড় মামানীর উদারতা আমার শরণার্থী জীবনের সকল কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিল।

বড় মামানীকে বহু ভাবে আমি পেয়েছি – হোসেনী দালানে শ্বশুরবাড়ির সবার সঙ্গে, গোপীবাগের, আগামসিহ লেনের, ধানমন্ডি ২ নম্বর রোডের এবং সর্বশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে। শৈশব থেকে দেখে আসছি মামানীর সেই এক এবং অপরিবর্তিত রূপ। তাঁর স্বামী ঢাকা বেতার থেকে যাত্রা শুরু করে দু'দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং মন্ত্রী হলেন কিন্তু আমার বড় মামানী সেই একই রকম থেকে গেছেন। বিকালবেলায় শাড়ি পাল্টিয়ে পরিপাটি হয়ে চা পরিবেশন করতেন – শত বারেও একটুও বদল হয় নি। অপূর্ব এক নিয়মের মানুষ ছিলেন। মামানী জানতেন আমি তাঁর হাতে রান্না করা এঁচোরের ডালনা অসম্ভব পছন্দ করি। তাই সম্ভব হলে খবর পাঠাতেন এঁচোরের ডালনা কবে রান্না হবে, যাতে করে আমি সেইদিন আসতে পারি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর পড়ার সময় বহুবার দুপুরের খাবার মামানীর সঙ্গে খেয়েছি। কেবল আমাকে সময়টা ঠিক রাখতে হতো। বেলা গড়িয়ে তিনের কোটায় গেলে – না, আর হবে না। মামানী বিশ্রামে চলে



গেছেন। ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে এ রকম – সঠিক সময়ে উপস্থিত হলেই হলো, 'বসে যাও খেতে'। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বড়মামুর আগামসিহ লেনের বাসা রেললাইন ধরে হেঁটে গেলে বেশি সময়ের পথ নয়। তাই প্রায়শই যেতাম আর মামানীর হাসিমুখের আপ্যায়ন পুনরায় আসার ইচ্ছা জাগিয়ে দিত। তাই ভাবতাম, যিনি ছড়াটি লিখেছেন – 'মামী এলো লাঠি নিয়ে পালাই পালাই' অবশ্যই তিনি আমার বড় মামানীকে দেখেন নি। দেখলে অবশ্যই দু'কান ধরে বলতেন – 'ছিঃ ছিঃ, মহা ভুল হয়ে গেছে'!

সে সময় এসব মুহূর্ত ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, যা আজকাল বিরল মনে হয়। কিন্তু যখন পেছনে তাকাই শুধুই অভিভূত হই এই ভেবে যে, কী চমৎকার আনন্দময় জীবন ছিল আমাদের! আর সেইসব আনন্দময় মুহূর্তগুলির একজন স্রষ্টা ছিলেন আমার বড় মামানী – যাঁকে তাঁর 'বড়বুয়া' সারা জীবন 'আহসানের বৌ' বলে ডেকে গেছেন।

মাঝে মধ্যে মামানী তাঁর লেখা ছোটগল্প পড়তে দিয়ে বলতেন, 'তৌহিদ, পড়ে বলো তো কেমন হয়েছে?' সেই তরুণ বয়সে যা-ই পড়তাম তা-ই ভাল লাগতো। বড়মামু কেন ছাপানোর ব্যবস্থা করতেন না – এই ভেবে আমার অনেক রাগ হতো।

একটি বিষয় না লিখলেই নয়। শৈশব থেকে বড় মামানীর মুখ থেকে কতবার যে শুনেছি তার হিসাব নেই। শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে ছায়াছবির মতো একটি দৃশ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের আঁধার নেমেছে। ঘরে অনেক মানুষের ভিড়। খাটের উপর লাল টুকটুকে শাড়ি পরে বড় ঘোমটা টেনে বসে আছে নতুন বৌ। আর তার ঘোমটা তুলে নতুন বৌয়ের মুখ দেখবার চেষ্টা করছে তিন বা চার বছরের এক খোকা। এই চিত্রটি নির্মাণ হয়েছে বড় মামানীর মুখে একটি কথা শুনতে শুনতে। ম্যাট্রিক পাস করে মামানীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। মামানীর মুখ থেকে শুনতে পেলাম – 'আমার বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসেছি। প্রথমেই তৌহিদ ঘোমটা তুলে মুখ দেখবার চেষ্টা করছে। আর সেই তৌহিদ কত বড় হয়ে গেছে!' পড়াশুনার এক-একটি ধাপ পার হয়েছি আর এ কথাটি বারবার শুনতে হয়েছে। এমনকি আমার বিয়ের দিনে তাঁর বাসা থেকে বরযাত্রা যাওয়ার সময়ও আমাকে শুনতে হয়েছে – 'সেই তৌহিদ কত বড় হয়ে গেছে! বিয়ে করতে চলেছে।'

বড় মামানী আমার কাছে অনেক অনেক বড়।

# বড় মামানী

## সৈয়দ ইজাজ আহমাদ (রুমী)

মা-মণি! হ্যাঁ, ঠিক এই নামেই জিনাত, নাসরীন, মেহরাব ও সিমাবরা তাদের মাকে অর্থাৎ আমাদের বড়মামানীকে আজীবন সম্বোধন করতে শুনেছি। অনেকদিন আগের কথা। সনটা ঠিক মনে পড়ছে না। সম্ভবত ১৯৫৫ সালের দিকে হবে। আমরা তখন পুরনো ঢাকার ৬৬নং আগামসিহ লেনে তদানীন্তন সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত একটি বাড়িতে বাস করতাম। সে সময়ে বড়মামা অর্থাৎ শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আহসান তাঁর পরিবার নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। আমার যদ্দূর মনে পড়ছে তাঁরা তখন করাচিতে থাকতেন। বড়মামা তখন পাকিস্তানের ফেডারেল করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। আমার মামারা সাধারণত ঢাকায় আসলে আমাদের বাসায় অন্তত একবার এসে তাঁদের প্রিয় ছোটবুয়া অর্থাৎ আমার আম্মা (সাফি/সৈয়দা সাফিয়া বানু) ও দুলাভাই অর্থাৎ আমার আব্বা (মৌলানা সৈয়দ আহমাদ রুমী)-এর সঙ্গে দেখা না করে ফিরতেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার নানা, নানী, বড়খালা সৈয়দা সুলতানা বানু এবং বড়খালু আমার আম্মাকে আমার নানার রাখা আসল নামকে সংক্ষিপ্ত করে সাফি বলেই ডাকতেন। তাই এবারও তাঁরা এসেছিলেন আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করতে। জিনাত ও নাসরীনদেরকে এবারই প্রথম মাকে মামণি নামে ডাকার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। এর আগে কখনো আমার মায়ের কূল, বাপের কূলের কাউকে মা-মণি (শুনতে লাগতো মামুনী) বলে সম্বোধন করতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তাই আম্মার কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছিলেন, ওরা আমাদের মামানীকে মামুনী বলে ডাকে কেন? আম্মা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ না করলেই নয় যে, বড়মামা, মেজমামা এবং তাঁদের খালাত ভাই ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হুসেইন সম্পর্কে আমার আব্বা-আম্মার মুখে তাঁদের লেখাপড়া, জ্ঞান-গরীমা, অতি উঁচু পর্যায়ের সম্মানের অধিকারী ছিলেন বলে একেবারে শিশুকাল থেকেই অনেক শুনে এসেছি। আমার আব্বার মুখে শুনেছি, একবার বড়মামা ইংল্যান্ড থেকে ঢাকায় ফিরে এসে



আব্বাকে বলেছিলেন, 'দুলাভাই, আমরা ইংল্যান্ডে পাকিস্তানের হাইকমিশন অফিসে হাইকমিশনার ড. এম এ মালেকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সেখানকার এক উঁচু কর্মকর্তা হাইকমিশনার সাহেবের সাথে আমাদেরকে আপনার শ্যালক বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা এত লেখাপড়া, এত দেশ-বিদেশ ঘুরে আপনার শালা হিসাবে পরিচিত হয়েছিলাম। আপনাকে মানুষ এত চিনে কীভাবে? তাও আবার ইংল্যান্ডের মতো দেশে?' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, ড. মালেকের সাথে আমার আব্বার একান্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। আরো উল্লেখ্য যে, সাজ্জাদ মামা এবং প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবও সেই সফরে বড়মামার সাথী ছিলেন বলে আমি জেনেছিলাম।

কয়েকদিন আগে সকালে আমি দ্বিতীয় দফায় ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ নাচ্ছু (নাসরীন) আমাকে ফোন করে জানালো যে, তারা মামানীর বিষয়ে একটা বই প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি যেন আমাদের বড়মামানীর উপর একটা কিছু লিখে খুব তাড়াতাড়ি তার কাছে পাঠিয়ে দেই। আজকাল আমার যেন কী হয়েছে – সকালের দিকে কোন ফোন পেলেই মনে হয় কোন দুঃসংবাদ কিনা? নাচ্ছুর কথা বলার পর জানতে পারলাম যে, ওরা একটা শুভ উদ্যোগ নিয়েছে। নাচ্ছু তো বাংলা সাহিত্যের দিকপতি সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের মেয়ে। তাই তার ধারণা মামার ভাগ্নে হিসাবে আমিও মামানীর উপর সাহিত্য না হোক নিশ্চয়ই একটা কিছু লিখে দিতে পারবো। নাচ্ছু তো জানে না যে, আমার নিজের নাম বাংলায় লিখতেই দু'একটা কলমের জীবনপাত হয়। আমি জানি, আমার জন্য এটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু কী করা, এটাই সত্য। ইদানিং আমার বড়ভাইয়ের মুহুরি অনিল কুমার সান্ন্যালকে ছাপানোর আগে শুদ্ধ করে দিতে অনুরোধ করি। আমি ই, ঈ, উ, ঊ, শ, য, স ইত্যাদি বাংলা হরফের ব্যবহারে একেবারেই অজ্ঞ। যাহোক, আমার মায়ের কূলের পরবর্তী বংশক্রমের সবচেয়ে বড় সন্তান আমাদের অতি প্রিয় রফিক ভাই (জনাব ফজলে রাব্বি) আমার লেখালেখির দৌড়ের ব্যাপারটা এতদিনে ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তাই ইদানিং আর আমাকে তাগিদ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। নাচ্ছুর অনুরোধ সরাসরি উপেক্ষা না করে বড়মামানীর উপর কিছু স্মৃতিকথা লেখার সাহস যোগানোর চেষ্টা করতে থাকলাম। যাহোক, এ পর্যন্ত অনেক অবান্তর কথাই তো আওড়ালাম। আশা করি পাঠকেরা কিছু মনে করবেন না। এবার তাহলে বড়মামানীর প্রসঙ্গে কিছু লেখার চেষ্টা করা যাক।

আমার স্মরণকালে সেবারই (১৯৫৫-৫৬ সাল) হয়তো প্রথম বড়মামানীকে দেখেছিলাম। আমরা ছোটরা সাধারণত বাসায় নতুন কোন মানুষজন আসলেই একটু দূরে দূরে থাকতাম। তাই তাঁরা বাসায় ঢুকতেই আমি স্বভাবসুলভ কারণে দূরে কোথাও অবস্থান নিয়েছিলাম। আব্বা আমাকে ডেকে এনে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে বললেন। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এঁরা তোমাদের বড়মামা-মামানী। আমি সালাম করে মামানীর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। তাঁর কপালের উপরে ঠিক সিঁথির নিচে মাঝকপালের খানিকটা ডানে বেশ বড় একটা অংশ আলতা রঙ করার মতো। মামানীর গায়ের রঙ এমনিতেই অতি উজ্জ্বল। তার উপরে আবার কপালে সেই লাল রঙ, পরনে চওড়া লাল পেড়ে একরঙা রেশমী শাড়ি – সব মিলে তাঁকে যে কি অপরূপা লাগছিল তা এখনও মনে করলেই ছবির মতো চোখের সামনে ভাসে। সালাম করার সময় মামানী বললেন, থাক থাক। সালামের দরকার নেই। বড়মামা ও মামানী আম্মার হাতের পরোটা ও আন্ডাপোচ খেতে খুবই পছন্দ করতেন। তখন দেখেছি, মামারা আমাদের বাসায় এলে (বিশেষ করে সকালে বা বিকেলে চায়ের সময়) বেশির ভাগ সময় পরোটা আর আন্ডাপোচই খেতে চাইতেন। তখন থেকেই আমারও এটা খুবই প্রিয় খাবার এবং নিয়মিত তা এখনও খেয়ে থাকি। তা আপনারা যাই মনে করেন না কেন।

বড়মামা-বড়মামানী আব্বা-আম্মার সাথে করাচির জীবন এবং সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করেছিলেন, যা আমার এখনও কিছু কিছু মনে পড়ছে। এরপর তাঁরা করাচি থেকে ঢাকায় চলে আসার পরে আমি নিয়মিতই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম এবং মামানীর আদর-যত্ন আমাকে তাঁদের প্রতি খুবই আকৃষ্ট করে তুলেছিল – যা তাদের জীবদ্দশায় অব্যাহত ছিল এবং জিনাত, নাচ্ছু, মেহরাব ও সিমাবদের সঙ্গে অন্তরের টান এখনও আছে এবং আল্লাহ সহায় থাকলে থাকবে আজীবন।

আমরা ভাইবোনরা ছোটবেলায় যে কোন কারণেই হোক বেশ অন্তর্মুখী ছিলাম। আদর-যত্ন না পেলে সহজে কোন আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় যেতাম না। শুধু ১৩ নম্বর হোসেনি দালান রোড অর্থাৎ আমাদের নানীবাড়িই এর ব্যতিক্রম ছিল। আমার যতটুকু মনে পড়ে নানীবাড়িতে একবার নানীর অনুরোধে বড়মামানী, রেজামামানী এবং আরো অনেককে গান গেয়ে শুনিয়েছিলাম। নানীবাড়িতে বেড়াতে গেলেই আমার নানী আমাকে গান



শুনানোর জন্য বলতেন এবং প্রায়ই 'আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা' এবং আরও একটা গান যা এখন মনে করতে পারছি না গাইতে বলতেন। আমিও একের পর এক গান গাইতে থাকতাম। এই লেখা রচনার সময় মনে পড়ছে যে, আমি বড়মামানীকেও গান গেয়ে শুনিয়েছিলাম।

একবার আম্মাকে নিয়ে নানীদের বাসায় গিয়েছি। এমন সময় বড়মামানীরাও আসলেন। আম্মাকে বড়মামানী সবসময় পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেন। সালাম শেষে আম্মা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ? মামানী বললেন, ছোটবুয়া, সবকিছুই আল্লাহর রহমতে ভাল কিন্তু সারা রাত একবিন্দুও ঘুম হয় না। এ যে কী কঠিন আজাব তা আল্লাহ ছাড়া কেউ বুঝবে না। সর্বোচ্চ মাত্রার ঘুমের ওষুধ খাই তবুও ঘুমের দেখা পাই না। এই কথা শুনে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল কিন্তু কারোরই কিছু করার ছিল না।

আমার নানা সৈয়দ আলী হামেদ (রহমতউল্লাহে আলাইহি) সাহেবের দশ সন্তানের ছেলেদের মধ্যে সবার বড় ছেলে আমার বড়মামা সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের স্ত্রী আমার বড়মামানীই ছিলেন ঐ বাড়ির বড় বৌ। তাঁকে আমি সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি। অনেক কিছুই শুনেছি এবং জানি। তাঁর সম্পর্কে আমি অনেক ভাল ভাল কথা বা ঘটনা লিখতে পারবো। কিন্তু এই অল্প সময়ে এবং এত ছোট কলেবরে তা গুছিয়ে লেখা সম্ভব হলো না। সময় সুযোগ হলে অবশ্যই আবার অনেকগুলো কলম ভাঙ্গার চেষ্টা চালাবো ইনশাআল্লাহ। যদিও আজকাল কম্পিউটারের যুগে লেখার জন্য কলমের ব্যবহার নেই বললেই চলে, আমিও সেই ১৯৮০ সাল থেকে কম্পিউটারেই দাপ্তরিক বা নিজের ব্যক্তিগত লেখালেখি করে আসছি।

বড়মামানীর জীবনের অনেকটা অংশই নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়েছে। এটা ছিল তাঁর একধরনের স্নায়বিক অসুস্থতা। কিন্তু তাঁর সাংসারিক জীবনে এর কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া পড়তে দেননি। আমার ভাবতেও অবাক লাগে যে, একটা মানুষ নির্ঘুম রাত কাটিয়ে কিভাবে সংসারের প্রতিটি বিষয়ে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করে চলেছেন? শুধুই কি সংসার, বিয়ের পর থেকেই দেখতে পেয়েছেন যে, বড়মামা একটা ভাল চাকরি করতেন। সেজন্য সামাজিকতা, পিতৃকূল, শ্বশুরকূল সর্বোপরি নিজকূল অর্থাৎ স্বামীর কূল কোনোটাই সামান্য চ্যুতি হতে দেখা যায় নি। যাহোক, আল্লাহতায়ালাই তাঁকে এত ধৈর্য্য, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া

করি – 'হে আল্লাহ তুমি তো গায়েবের মালিক। তুমি সব জান, সব দেখ, সব শুন এবং তুমিই একমাত্র মাফ করনেওয়ালা। তুমি তো বলেছ তোমার কাছে চাইলে তুমি কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দাও না। এছাড়া আর কার কাছেই বা চাইব? এ দুনিয়াতে তুমি তাঁকে ঘুমহীন আজাব দিয়েছ, আখেরাতে এর পরিবর্তে তাঁর জীবনের ছোট-বড় সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাঁর জন্য খাস করে জান্নাতুল ফিরদাউস নছিব কর, আ-মী-ন।'



# মামানীকে স্মরণ : মামানীকে স্মরণ

## সৈয়দ ইহসান আহমদ রুমী (লাবিব)

বরেণ্য সাহিত্যিক, কবি এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী সৈয়দ আলী আহসানের স্ত্রী কমর মুশতারী সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তাঁদের অতীত জীবনের কিছু ঘটনা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেই সূত্রে আমার এই স্মৃতিচারণ।

সময়কাল ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯। আমার বয়স তখন সাত বছর। আমার বর্তমান বয়স আটান্ন বছর। একান্ন বছর আগেকার কথা খুব একটা মনে নেই। তবু আমার মামাতো বোন শ্রদ্ধেয়া নাচ্ছু আপার অনুরোধে সেই সময়কার দু'একটি ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু আলোচনা করছি।

১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সৈয়দ আলী আহসান এবং তাঁর স্ত্রী কমর মুশতারী ও তাঁর পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান : সম্ভবত আমার বড় মামা, মামী, তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে আগা মসিহ লেনের একটা ভাড়া বাসায় থাকতেন। মূল বাড়িটার সামনে বিরাট একটা বারান্দা ছিল। বারান্দার সামনে ছোট একটা মাঠ। তারপর ছোট দুটি বাইরের অতিথিদের থাকা এবং বসার ঘর। ঐ সময়কালে মামা বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তখন এই পজিশনে কর্মরত ব্যক্তিরা ভাল বেতন পেতেন। অর্থাৎ বলা যায়, উচ্চমধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক অবস্থানের একটি পরিবার।

আমার বর্তমান অবস্থা (২০১৬) : বর্তমানে আমি তিনটি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছি। আমার অধীনে অর্থাৎ সাব-কন্টাক্ট লিংকিং-এ আরো কয়েকটি ফ্যাক্টরি চলে। বলা যায়, আমার নিজের এবং সাব-কন্টাক্ট মিলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় দশ হাজার।

১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ সালে আমার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা : আমার আব্বা সৈয়দ আহমদ রুমী হাইকোর্টে খুব অল্প বেতনে ছোট চাকরি করতেন। আমরা থাকতাম আজিমপুর কলোনীর ৪৭ নম্বর বিল্ডিংয়ের এল নং কর্নার ফ্ল্যাটে। ঐ ফ্ল্যাটে দুটি বেডরুম এবং একটি খাবার রুম/স্পেস ছিল। ঐ সময় আমরা ছয় ভাইবোন, আব্বা, আম্মা এবং কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় পড়ালেখা করতে আসা আমার চাচাতো বোন জুলিয়েট আপা সহ আমরা সকলেই আজিমপুরের ঐ দুই রুমের বাসায় থাকতাম। ঐ সময়

আমার চাচাতো ভাইবোনেরাও ঢাকায় এসে আমাদের বাসায় থাকতেন। ঐ বাসায় আমার বড়মামী প্রায় আসতেন। যতদূর মুরুব্বিদের কাছ থেকে শুনেছি – আমার এই বড়মামীই বড়মামাকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসার জন্য প্রভাবিত করতেন। আমার বড়মামী পরিবারের বড় বৌ হিসেবে আত্মীয়স্বজনদের বাসায় সময় সময় যাওয়ার নৈতিক ও আত্মিক দায়িত্ববোধ অনুভব করতেন। এখন বুঝতে পারি, উনার ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলী ছিল অত্যন্ত শক্ত ও মজবুত। উনার ঐ সময় অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল উচ্চ-মধ্যবিত্ত পর্যায়ের। ঐ সময়ে আমাদের এবং আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজনের আর্থিক অবস্থা ছিল রীতিমত গা শিউড়ে উঠার মতো নিম্ন পর্যায়ে।

একটি ঘটনা আমার মনে আছে। আমার আম্মা আমার এবং ছোটভাই মারুফের জন্য বছরের (দুই ঈদে দুই জোড়া) শার্ট এবং প্যান্ট নিজ হাতে কেটে সেলাই করে বানিয়ে দিতেন। প্যান্ট ও শার্ট দর্জির দোকানে দিয়ে বানানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার আব্বার ছিল না। একবার ঈদে আম্মা আমাদেরকে নতুন কাপড় বানিয়ে দিতে পারেন নি। এখন বুঝতে পারি, টাকাপয়সার অভাবে তা হয়তো সম্ভব হয়নি। তখন ছোট ছিলাম। বুঝতে পারিনি টাকার অভাবে আম্মা আমাদেরকে ঈদের কাপড় কিনতে এবং বানিয়ে দিতে পারছেন না। আমি জেদ ধরেছিলাম। অনেক কান্নাকাটি করেছিলাম। আম্মাকে বলেছিলাম, আমার মামাতো ভাই হামিমের কথা। হামিমের উদাহরণ দিয়ে আমি জেদ ধরেছিলাম এবং বলেছিলাম, হামিম এত সুন্দর সুন্দর শার্ট-প্যান্ট পরে, আমাকে কেন আপনি দেন না? আমি তখন হাফপ্যান্ট পরতাম। আমি জেদ ধরেছিলাম ফুলপ্যান্টের জন্য। জেদ ধরে প্রচণ্ড কাঁদতে কাঁদতে আম্মাকে কত কথাই না বলেছি। তা তো আর মনে নেই। আম্মা ছোটভাই সৈয়দ আলী রেজার কাছে চাইলে কোনরকম অপমান হওয়ার ভয় ছিল না। কারণ অর্থনৈতিক দৈন্যতার দিক থেকে আমাদের পারিবারিক অবস্থান এবং হামিমদের পারিবারিক অবস্থানের মধ্যে কম-বেশি সামঞ্জস্য ছিল। মানুষ হিসেবে রেজা মামা ছিলেন ধৈর্য্য, সহ্য, নম্রতা ও ভদ্রতার শীর্ষে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বড়মামী গরিব আত্মীয়স্বজন, ভাগনে-ভাগনিদের নতুন কাপড় দিতেন। আরো প্রয়োজনীয় আর্থিক সাপোর্টও দিতেন। অনেক আত্মীয়স্বজনকে মাসে মাসে নিয়মিতভাবেও সাহায্য করতেন। তাঁর কথা আমরা কখনো ভুলবো না।



# আমাদের বড় মামানী

## সৈয়দ মোহাম্মদ সাবের (তুলি)

আজ ১৭ই মার্চ নাচ্ছু আপা বললেন, বড় মামানীর উপর (যাঁর ভাল নাম কমর মুশতারী) একটা লেখা দিতে। তাও আবার সময়সীমা মাত্র দুইদিন। রাজী হয়ে গেলাম। ৩৩ বছর আগে যিনি আমাদের ছেড়ে না-ফেরার দেশে চলে গেছেন।

স্মৃতিতে মনে পড়ে বড় মামানী ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী এক মহিলা। আমার মায়ের সঙ্গে ছিল খুব সখ্যতা। মামানী আমার আম্মাকে আপা বলে ডাকতেন। যতদূর মনে পড়ে, ঢাকায় থাকার সময় মাঝে মাঝেই আমাদের বাসায় চলে আসতেন। সঙ্গে বড় মামু। তাঁরা আম্মার সঙ্গে গল্প করতেন।

বড় মামু তখন সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা। মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী এলেন ঢাকায়। বেইলী রোডের বাসায় মোহাম্মদ আলী আসবেন। মামানী আমাদেরকে ডাকলেন। চলে গেলাম সকলে। মোহাম্মদ আলীকে সামনাসামনি দেখলাম আমাদের মামানীর জন্য।

বড় মামানীর মৃত্যুর পর বড় মামু শুরু করলেন কমর মুশতারী স্মৃতিপদক দেয়া। এই পদক দেয়ার মাধ্যমে যাতে মামানীকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠানে আমি সঞ্চালকের দায়িত্ব পেয়েছি।

লিখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, আমার মায়ের মৃত্যুর মাত্র ১৩ মাস পর মামানী আমাদের ছেড়ে চলে যান। সময়টা ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাস। রাত ৯/১০টার সময় হঠাৎ বাসার দরজায় করাঘাত। দরজা খুলতেই দেখলাম হামিম ভাই দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আরেকজন। বললেন – বড় চাচী মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম কলাবাগানের বাসায়। সেখানে সব আত্মীয়স্বজন আসতে শুরু করলো। যতটুকু মনে পড়ে, সারা রাত নাজমা আপা, সুজা ভাই ও আরো অনেকের সঙ্গে আমিও সেখানে ছিলাম। অপরাহ্নে বনানী কবরস্থানে দাফন হলো। কবরে নামলাম আমি। ভাগ্যের কী ব্যাপার, আমার মনে হয় আজ অবধি আমি এতো আপনজনদেরকে কবরে নামিয়েছি যা কিনা হিসাব করা কঠিন! বড় মামুকেও শেষ জায়গায় রাখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

মামা-মামী, খালা-খালু সব মিলিয়ে ছিলেন ১৯ জন। আজ আছেন মাত্র ৩ জন। সবাই চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। আমার বিশ্বাস, বড় মামানী এখন আমাদের মাঝে নেই বটে কিন্তু তিনি দেখছেন আমাদের সকলকে।

# মিনা আপার কথা

## সালমা বানু পলা (টুকটুক)

আমার ফুপাতো বোন মিনা আপা – আমরা যাকে ডাকতাম মুনি আপা। তাঁর ভালো নাম ছিল কমর মুশতারী। লেখাপড়া করেছেন কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। উনারা এক ভাই এবং এক বোন। মুনি আপার বিয়ে হয়েছিল সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের সঙ্গে। আমার ছোটবেলা কেটেছে উনাদের সঙ্গে। উনি আমার বড় বোন।

মুনি আপা ছিলেন আমার দেখা অত্যন্ত অমায়িক, নম্র ও ভদ্র, মৃদুভাষী একজন মানুষ। তিনি কথা বলতেন খুব আস্তে আস্তে, নিচু স্বরে। উনার বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল আড়াই বছর। আমাকে নাকি একটা টুলের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে নতুন জামাইয়ের গলায় ফুলের মালা পরানো হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, দুলাভাই কালো বিলাই। মুনি আপা এই গল্প সবসময় করতেন। মুনি আপা ছিলেন খুব সুন্দরী। উনার কপালে একটা গোলাপী রঙের দাগ ছিল, যেটা মাঝে মাঝে গাঢ় বর্ণ হয়ে যেতো। আমরা শুনেছি, ওটা ছিল রাজটিকা।

আমরা যখন সবাই গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম তখন দুলাভাইকে নিয়ে রঙ খেলা হতো। আমি মাঝে মাঝেই মুনি আপার বাসায় চলে যেতাম। সারা দিন উনার কাছে থাকতাম। আমি যখন যেতাম তখন মুনি আপা নিজ হাতে আমার জন্য রান্না করে আমাকে খাওয়াতেন। উনার ইলিশ মাছের পাতুরি আর আস্ত ইলিশ রোস্টের স্বাদ আমার এখনো মনে আছে। সারাদিন মুনি আপার সঙ্গে গল্প করতাম। তিনি আমার কথা শুনে স্নেহের হাসি হাসতেন।

মুনি আপার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে জিনাত এবং নাসরিন, আমি আর আমার ছোট বোন রুমা – আমরা একসঙ্গে থাকতাম। একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি। জিনাত, নাসরিন, মেহরাব, সীমাব – এরা আমাকে ডাকে টুকটুক খালাম্মা। পরবর্তীতে মুনি আপা দুলাভাইয়ের চাকরির সুবাদে করাচি চলে যান। করাচি যাওয়ার সময়ে সঙ্গে করে তিনজন কাজের লোক নিয়ে যান – রশিদ, রহমান আর সুরতি। করাচি থেকে এসে মুনি আপা থাকতেন আগামসিহ লেনের একটা বাসায়। মুনি আপা, বাবলু ভাইয়া এদের কাছে কেটেছে আমার ছেলেবেলা। খুব অসময়েই চলে গিয়েছিলেন এই দুই ভাইবোন। আল্লাহ উনাদের জান্নাতবাসী করুন – এই দোয়াই করি।



# আমার ফুফু

## সানজিদা জামান খান

'ফুনা' – এই শব্দ বা ডাকটা আমার জীবনে অনেকখানি জুড়ে আছে। ইনি কমর মুশতারী আহসান। ডাক নাম মিনু। কিন্তু আমার কাছে তাঁর পরিচয় – তিনি আমার ফুনা। ফুফু-ভাইজির সম্পর্ক কতটা সুন্দর হতে পারে সেটা আমাদের দেখলেই বোঝা যেত। আমার বড় হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে উনার নানা বিষয়ে পরামর্শ আজও আমার জীবনে কাজে আসে। চুল, ত্বক কীভাবে ভাল থাকবে, সাংসারিক বিষয়ে কী করলে ভাল হবে – সবই আমি উনার সঙ্গে আলোচনা করতাম।

বিভিন্ন সময়ে ফুসাব (সৈয়দ আলী আহসান) বিদেশে যেতেন। তখন আমি ফুনার কাছে থাকতাম। কত রকম গল্প যে হতো তার ঠিক নেই। একসঙ্গে মার্কেটে গিয়ে শাড়ি কেনার দিনগুলো আজও মনে পড়ে। উনার প্রিয় রঙ ছিল লাল। যত শাড়ি দেখি না কেন শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জনে মিলে একটা লাল শাড়ি কিনে আনতাম।

ফুনা ছিলেন যেমন সুন্দরী, তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। তাঁর যেমন ছিল সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান, তেমনই তিনি ছিলেন ধার্মিক। এমন কোন দিন ছিল না যে উনি ওজিফা বা কোরান শরীফ না পড়তেন। তাই বুঝি উনাকে আল্লাহপাক শান্তির সঙ্গে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন।

মাগরিবের নামাজ পড়ে সন্ধ্যায় উনি চলে গেলেন দুনিয়া থেকে। তবে আমার বড় দুঃখ যে, উনি আমার সংসার দেখে যেতে পারেন নি। যেদিন আমার সংসার দেখতে উনি আর ফুসাব আশুগঞ্জ সার কারখানা অর্থাৎ যেখানে আমার স্বামী কর্মরত ছিলেন সেখানে যাবেন ঠিক করেছেন, তার তিন দিন আগে ফুনা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

তিনি ছিলেন আমার একমাত্র ফুফু। তার একমাত্র ভাইয়ের একমাত্র জাতিজী কেমন সংসার করছে, তা আর উনার দেখা হয়নি। আল্লাহপাক উনাকে বেহেশত নসীব করুন। আমার শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা উনার জন্য তেমনি আছে। তাঁর কথা মনে হলে এখনও মনটা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

# আপুমণি

## নুসরাত কমর চৌধুরী (প্রসন্না)

আপুমণি ছিলেন আমাদের, মানে তাঁর নাতি-নাতনিদের সকল কাজের প্রেরণার উৎস। কোন ভাল কাজ করলেই তিনি শিশুদের মতো খুশি হয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করতেন। আপুমণি ছিলেন নরম ও কঠিন মনের অপূর্ব মিশ্রণ। তিনি ছিলেন এক সাহসী ও বিদ্রোহী নারীর প্রতিচ্ছবি। আমার সংরক্ষণে আমার কাছে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি রয়েছে – যা তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে তাঁর ভালবাসার মধ্য দিয়ে। একটি চিঠি এখানে সবার পড়ার জন্য দিলাম।

যখন আমরা নানাবাড়িতে বেড়াতে আসতাম আমার ঘুমানোর জায়গা ছিল তাঁর খাটে, তাঁর পাশে। আর ডালি আপ্পি আমেরিকা থেকে দেশে এলে তাঁর সঙ্গে শোবার জায়গা নিয়ে মোটামুটি একটা জমি দখলের মতো লড়াই চলতো। পরে আপুমণির মধ্যস্থতায় এর মীমাংসা হতো। আমার এই প্রিয় মানুষটি আমার নয় বছর বয়সে আমাকে ছেড়ে চলে যান। মনে পড়ে, নানা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি থাকার সময় তাঁদের দু'জনের হাত ধরে আমি প্রথম স্কুলে ভর্তি হই।

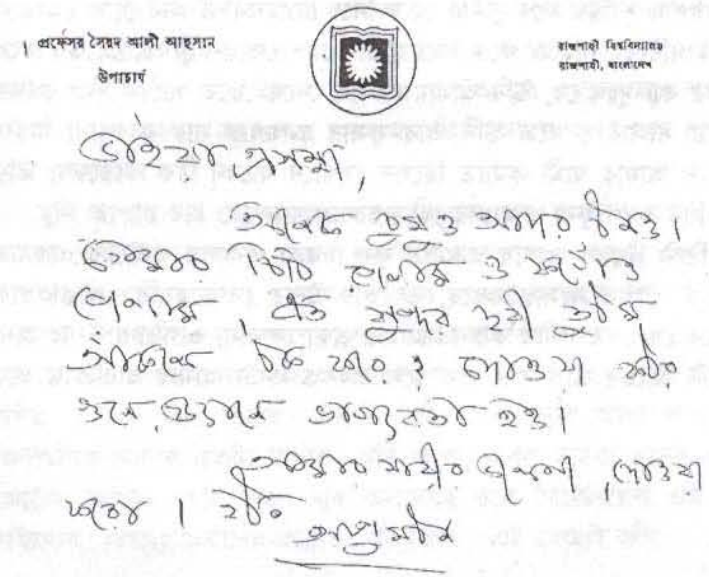




# আমার অনেক কাছের শাশুড়ি-মা

## রীতা মেহরাব

কৃষ্ণচূড়া গাছে লাল রঙ ছড়িয়ে অনেক ফুল ফুটেছিল। রোদের ঝকমকে আলোয় গোলাপ আর গন্ধরাজের স্নিগ্ধ সৌরভে বাড়ির আঙিনাটা বড় পবিত্র হয়ে উঠেছিল। ছোট্ট আবীরকে নিয়ে মামণি হেঁটেও বেড়িয়েছিলেন দিনের শুরুটাতে। এমনি এক বড় সুন্দর দিনটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন।

আমার মা-বাবার মতো কোন না কোন স্মৃতি নিয়ে প্রতিদিন আমার মনে যিনি জেগে উঠেন, ভেসে বেড়ান, তিনি আমার অনেক কাছের শাশুড়ি-মা। মানে আমার 'মামণি'। মামণিকে নিয়ে লিখবো না এটা কি হতে পারে? তবে কী লিখবো আর কী লিখবো না? কারণ লিখে তো শেষ করা যাবে না।

উনার সঙ্গে আমার সময়কালটা মাত্র সাড়ে তিন বছরের ছিল। অথচ আমার মনে হয় যুগ যুগ ধরে সম্পর্ক ছিল। আর রেখেও গেছেন সেই সম্পর্কের রেশ। আসলে উনি আমাকে জন্ম দেন নি কিন্তু আমার সঙ্গে মায়ের মতো দায়িত্ব আর স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে গেছেন – যার জন্য উনার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা।

আমার চোখে উনি অনেক গুণে ভরা একজন সম্রাজ্ঞী ছিলেন, যাঁর অন্তর ছিল ন্যায়-নীতি দিয়ে ভরা। একজন কঠোর মানুষ ছিলেন ঠিকই কিন্তু এই শক্ত খোলসের ভিতরে নরম মনের মানুষও ছিলেন যাঁকে আমার অসম্ভব ভাল লেগেছিল। তাঁর ভিতরটা পবিত্রতা আর পরিচ্ছন্নতায় ভরা ছিল। সে কারণে কি উনি সবসময় গোছাতে আর সাজাতে পছন্দ করতেন? নিজেকেও সাজাতেন আর আমাকেও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি আমার মনের সব জায়গাটা উনার জন্য দখল করে নিয়েছিলেন। সেই স্থানটা আর কেউ পূরণ করতে পারেন নি।

মামণি ছিলেন অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। তেমনি অন্তরে ছিল তাঁর ভালবাসার আকাশ। গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথা বলতেন কিন্তু স্বরে থাকতো সুগভীর মায়া। মামণি নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রেখেছিলেন। সমস্ত কাজে সময়কে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতেন। ছোট্ট একটা রুমালকেও তিনি ইস্ত্রি করে ভাঁজ করে রাখতেন। ফেলে দেওয়া কাপড়ে ফুল তুলতেন

আর যেখানেই যে জিনিসটা ভাল লাগতো সমাদর করতেন আর আমাকে বলতেন, 'আমাকে কবরে গিয়েও বোধহয় গোছাতে হবে।' আমরা দু'জনেই হাসতাম।

লিখতে গিয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মামণি প্রায় অসুস্থ থাকতেন। কারণ উনার ইনসোমনিয়া রোগ ছিল। কারোরই বোঝার উপায় ছিল না যে, উনি রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে থাকতেন। অথচ প্রতিদিনের কাজ নিয়মমাফিকই চলতো। উনাকে দেখেছি কোন অন্যায়কে সহ্য না করতে। মুখের ওপর সেটা বলে দিতেন – ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, আত্মীয় আর অনাত্মীয় হোক, মানুষ পছন্দ করুক আর না করুক। এজন্য অনেকের কাছে উনি অপ্রিয় ছিলেন। তাতে উনার কিছু এসে যেতো না। সত্যের পাবন্ধি উনি ছিলেন। এটা আমার অসম্ভব ভাল লাগতো। সেই অদম্য আত্মার প্রতি, সেই সাহসের প্রতি আমার বিনম্র সালাম।

উনি ছিলেন ছোট্ট পরিবারের আদর ও আহ্লাদে তৈরি হওয়া একমাত্র কন্যা। উনার এক ভাই ছিল। মামণির বাবার বাড়ির পরিবেশটা ভিন্ন সাংস্কৃতিক মণ্ডলে গড়া ছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির সম্মানার্থে সাংস্কৃতিক জগতে আর ফিরে যান নি। তবে গান শুনতে খুবই ভালবাসতেন। উনি লেখার জগতের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। উনার ২/৪টি বইও প্রকাশিত হয়েছে। সংসারের দায়িত্বের চাপে পড়ে এই মনের ইচ্ছাটাকেও উনি চাপিয়ে রাখলেন – সংসারকেই উনি সময় দিলেন। প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে গেছেন পরিবেশকে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতায় ভরিয়ে তোলবার জন্য। পাতাবাহারের স্নিগ্ধ ছোঁয়া দিয়ে আর নানা ধরনের ফুলের সমারোহে সাজিয়েছেন নিজের অন্তর আর উনার চারপাশকে।

মামণির মৃত্যুর কয়েক দিন আগে দেখেছিলাম উনি বড় শ্রান্ত ও ক্লান্ত। আর মনটা বড় অশান্ত। তাঁর চোখ জুড়ে দেখেছিলাম বিকশিত হবার স্বপ্ন, ভালবাসার স্বপ্ন। কিন্তু বাস্তবতার চাপে ব্যক্তিগত স্বপ্নগুলো ফুটতে পারে নি। তাই সবসময় মনে হতো উনাকে আমি অনেক ভালবাসবো। উনার কাছেই থাকবো। আর উনার স্বপ্নগুলো ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবো।

আমি আর মামণি পাশাপাশিই ছিলাম সবসময় কিন্তু আমাকে একা রেখেই মামণিকে চলে যেতে হলো না-ফেরার দেশে। তবে এটা বলতে পারি তিনি এতো ভালবাসায় আমাকে ভরে রেখে গেছেন যার শক্তি দিয়ে আমি পৃথিবীতে অনেক সহজভাবে চলতে পারছি। উনি আমাকে আকাশের



দিকে তাকিয়ে ভাবতে শিখিয়েছেন, স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন – উনাকে আমার সালাম।

তাঁর সঙ্গে প্রথম মুহূর্ত থেকেই বিশ্বাস আর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝেই মনে হয়, উনি বোধহয় আমার মনটা পড়তে পেরেছিলেন। যেমনটা পেরেছিলাম আমি। তবে মনে হয় দু'জনের আত্মার ভিতরের বাজনার শব্দ একই ধরনের। কিন্তু কোন্ বাজনার শব্দ বুঝতে পারি না – সেটা কি তবলার তাল, নাকি সেতারের ধ্বনি?

এই মুহূর্তে মামণির লেখা *অশান্ত মন শান্ত হল* বইটির নাম মনে পড়ে গেল। তাই উনার ভালবাসার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার ভালবাসার নিঃশ্বাস মিলিয়ে দিলাম। দু'জনেই প্রশান্তিময় জগতের মধ্যে বিলীন হয়ে আছি। পার্থক্য শুধু উনি ওপারে আর আমি এপারে।

# আম্মার স্পর্শ

## সৈয়দ আলীউল আমীন (সিমাব)

জগতে যত প্রকার ফুল আছে, ফল আছে এবং যত প্রকার ওষুধ আছে, যত প্রকার স্বচ্ছ মনোরম রত্ন আছে এবং উজ্জ্বল লতা ও উত্তম ফলবান যত বৃক্ষ আছে, মনোরম যত সরোবর আছে, সবকিছুই মানুষের কল্যাণে নিহিত। আমি শৈশবে এ কল্যাণের স্পর্শে মানুষ হয়েছি। এখানে আমি এই সকল স্পর্শের মধ্যে এখনও আমার মার স্পর্শ খুঁজি এবং আমি ছুটে চলে যাই যে কোন প্রান্তরে। আমার মনে হয়, এরাই আমার মার সেই স্পর্শ আমাকে দেয় এবং আমি তাঁকে পাই আমার উপলব্ধির শক্তিতে। কিন্তু এরপরও আমার নিজস্বতার মধ্যে আমি আবদ্ধ থাকি এবং এখন একাকী পথ চলি। এখন সবকিছুই আছে, সকল স্পর্শও আছে কিন্তু মার সেই স্পর্শ নাই।

আমরা চার ভাইবোন এবং আমি সবার ছোট। তাই মনে হয় মার একটু বেশি আদরেরই ছিলাম। কিন্তু সে আদর কখনো সীমা লংঘন করতো না। বড় হতে লাগলাম প্রকৃতি এবং মার সান্নিধ্যেরই কল্যাণে। আমি তখন নিজে নিজে ঘুমুতে পারি। আমি যত বড় হতে লাগলাম তখন আমার ইচ্ছা, আনন্দ সবকিছুই মার উপর নির্ভরশীল। আমার মা একটি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতেন। ঠিক যেমন প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে চলে, তবে চলে আমাদের জন্যই। জ্ঞান হবার পর থেকে আমাদের ভোর হবার সাথে সাথে বিছানা ত্যাগ করতে হতো। নামাজ পড়ে উনার সঙ্গে প্রাতভ্রমণ আমাদের বাধ্যতামূলক ছিল এবং ফিরে এসে পরিপাটিভাবে নাস্তা পরিবেশন করতেন। শুধু নাস্তা নয়, দুপুর এবং রাতের খাওয়ার সময়ও বাঁধা নিয়ম ছিল। আমার মা সেই যুগের আধুনিক মুসলিম (অত্যাধুনিক নয়) পরিবেশে বড় হয়েছিলেন যার স্বাক্ষর তিনি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত রেখে গেছেন। কিন্তু আমার বাবার পরিবার সম্ভ্রান্ত সুফি পরিবার। ইসলাম যেভাবে আমাদের চলতে বলেছে ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা চলেন। কিন্তু আমার মা যথার্থভাবে বাবার পরিবারের নিয়ম মেনে নিয়েছিলেন। কারণ উনার পারিবারিক শিক্ষাই উনাকে সব শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। আমার বাবার জন্ম সুফি পরিবারে



কিন্তু মনের দিক থেকে তিনিও আধুনিক ছিলেন। তার কারণ দুটি পরিবারই শিক্ষিত ছিলেন। মা সেই যুগের এনট্রান্স পাশ। পড়ালেখা করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। অবশ্য নানার চাকরির বদলীর জন্য নানীর বাবার দেওয়া স্কুল পাইকপারা উচ্চ বিদ্যালয় (মানিকগঞ্জ) থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। আমার তিন ভাইবোন মাকে 'মামণি' বলে ডাকতো কিন্তু কেন জানি আমি মাকে 'আমমা' বলে ডাকতাম। হয়তো উনার স্পর্শই আমাকে এই ডাকে ডাকতে শিখিয়েছিল। আমি ছোটবেলা থেকেই মার খুব কাছাকাছি থাকতাম। হয়তো ছোট বলে এবং মাও আমাকে মনে হয় একটু বেশি আদর করতেন। কিন্তু শাসন ছিল কড়া। তবে কখনো ওনার হাতে মার খেয়েছি বলে মনে হয় না। উনার চোখের শাসনই যথেষ্ট ছিল, অন্তত আমার জন্য। ঠিক প্রকৃতি যেমন বিচিত্ররূপে প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে বড় হতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি।

আম্মার বিচক্ষণ দূরদর্শিতার আশ্রয় এখনও অনুভব করি, যখন কোন বটবৃক্ষের কাছে আমি যাই। উনার স্পর্শ অনুভব করি। আসলে তিনি আমাদের পরিবারের বটবৃক্ষই ছিলেন। বিয়ের আগে থেকেই উনার লেখার প্রতি আগ্রহ ছিল এবং বিয়ের পরেও প্রতিদিন সময় করে তিনি লিখতেন। কিন্তু বিরাট কিছু হবার মোহ ত্যাগ করেছিলেন আমাদের জন্যই। আম্মার দুইটি গল্পের বই আছে। সেই সময় সাহিত্য মহলে বই দুটি আলোড়ন তুলেছিল এবং পরিচিতিও লাভ করেছিলেন সাহিত্যিক অঙ্গনে। ভাল গান গাইতে পারতেন কিন্তু সুফি পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার জন্যই তিনি গানের মোহ ত্যাগ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। তিনি লেখাকে বিসর্জন দেন নি, শুধু ডাইরির পাতায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। আমি তখন বড় হয়েছি। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার বই কেন আর বের করছেন না। সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন তিনি, বটবৃক্ষের নীচে যেমন চারাগাছ খুব বড় হতে পারে না, আমারও সে একই দশা। এখানে তিনি বুঝিয়েছেন, আব্বার কথা। তিনি আরও বলেছিলেন, আমরা দু'জনেই যদি একই অঙ্গনে সমান তালে চলবার চেষ্টা করি, তাহলে তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে কে? বাইরের জগতের বটবৃক্ষ হওয়ার চাইতে সংসারের বটবৃক্ষ হওয়াকেই আলিঙ্গন করেছিলেন একমাত্র আব্বা এবং আমাদের জন্যই।

আমি আমার মায়ের কাছ থেকে সময়জ্ঞান শিখেছি। সময়কে তিনি প্রাধান্য দিতেন সবচাইতে বেশি। আম্মা বলতেন, যে সময় চলে যায় সে সময় কিন্তু কখনই ফিরে আসবে না। তাই তোমরা সঠিকভাবে সময়কে

ব্যবহার করবে। যেমন আমাদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা, খেলাধুলা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ইত্যাদি ঠিক যখন যে সময়ে করা দরকার, তা এতো সুন্দরভাবে নির্মাণ করেছিলেন যাতে কখনই আমার মধ্যে কোন অপূর্ণতার ক্ষোভ অনুভূত হয়নি। তিনি বলতেন, সময়কে যদি জীবনে প্রাধান্য না দাও তাহলে সময়ের কল্যাণ থেকে তুমি বঞ্চিত হবে। তুমি চেয়ে দেখ প্রকৃতির পানে – তারা তাদের সময় মেনেই চলছে। আমি এখনও সময়কে প্রাধান্য দিয়েই চলেছি এবং প্রতিটি সময়ে মার স্পর্শ অনুভব করি।

আম্মার কপালে জন্মগত লাল শিখার মতন একটি চিহ্ন ছিল। এই চিহ্নের নাম জড়ুল। কেন এই নাম তা আমার জানা নেই। কিন্তু সে চিহ্ন অপূর্ব সুন্দর ছিল এবং তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেতো। সেজন্য হয়তো তিনি আমাদের চার ভাইবোনকেই জীবন কি এবং জীবনের তাৎপর্য কোথায়, শুভ ও মঙ্গল কীভাবে, কোন পথে গেলে পেতে পারবো, তা উনার দৃঢ়, স্বচ্ছ, সত্য এবং উচ্চ উচ্চারণের মাধ্যমে শিখিয়েছিলেন। উনার একটি সংকল্প আমি জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি যে, কেউ আমরা কোনরকম অন্যায় করতে দেখলে তার প্রতিবাদ আড়ালে নয়, বরং সামনেই বলে দিতেন। এজন্য কারো কারো কাছে তিনি হয়তো অপ্রিয় হয়েছেন কিন্তু পরে দেখা গেছে বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তিনি প্রিয় হয়ে থাকতে পেরেছেন। আমি মাঝে মাঝে এতো স্পষ্ট কথা বলতে না করতাম। তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, সমাজ কাউকে এতো ভয় পেও না এবং আল্লাহ নিষেধ করেছেন যে, কারো অবর্তমানে খারাপ কিছু না বলতে। হয়তো দেখবে, সমাজ তোমাকে প্রথমে সমালোচনা করবে কিন্তু একদিন তোমার সত্য, স্বচ্ছ ও স্পষ্টতা অন্যকে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করবে। আর সেই অন্যরা যদি না ফেরে সেখানে তোমার কোন দোষ থাকবে না। বরং আত্মতৃপ্তি পাবে। কারণ তুমি তাকে সঠিক পথ দেখানোর কথাই বলেছো এবং এজন্যই তুমি সমাজে বুক ফুলিয়ে চলতেও পারবে। এই আদেশ-নির্দেশ আমাদের জন্য শিরোধার্য ছিল এবং এখনও আমি ঐ তিনটি নির্দেশ মেনে চলে আসছি। আমি আমার আম্মার আয়ত্তে বড় হয়েছিলাম বলেই কিছু না থাকতেও আমার অনেক কিছু আছে বলেই মনে করি। আম্মার প্রতিটি স্পর্শের কল্যাণে আল্লাহর রহমতে ভাল আছি।

আম্মা যেহেতু বিধাতার সকল কল্যাণে বিশ্বাস করতেন, তাই প্রকৃতির যে অনন্ত রূপ আছে সেটাকেই অনুসরণ করে চলতেন। বড় হবার পর থেকে কোনদিন উনার প্রসাধনীর প্রতি আগ্রহ দেখিনি। এমনকি সামান্য



লিপস্টিকও তিনি ব্যবহার করতেন না। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তিনি লিপস্টিক ব্যবহার করেন না? একটু হেসে উত্তর দিলেন, আল্লাহ মানুষকে যে রূপেই এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাকে সেই রূপেই ফিরে যেতে হবে এবং আল্লাহর দেয়া রূপকে অসম্মান করার কোন ইচ্ছে আমার নেই, সাহসও নেই। আরও বলেছিলেন, বিয়ের আগে কখনো লাগাই নি। শুধুমাত্র বিয়ের সময় লাগিয়েছিলাম। এরপর আর নয়। আসলে আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যের অস্তিত্বকে তিনি সম্মান করতেন এবং এই নিয়েই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং সত্যি উনাকে সুন্দরও লাগতো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য ছিল। টেবিলে রোজকার খাওয়া এতো সুন্দরভাবে পরিবেশন করতেন যে, খাদ্যতালিকা তখন গৌণ হয়ে পড়তো। ছোটবেলা থেকেই তিনি শিখিয়েছিলেন যে, ভাতের একটি দানাও যেন টেবিলে না পড়ে। আসলেই পড়তো না। কারণ ছোটবেলা থেকেই যে সুশাসনে বড় করেছিলেন। তা এখনো আমার মধ্যে বিদ্যমান।

আম্মার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল – তিনি কোন বিপদে অস্থির হতেন না। আব্বার চাকরি জীবনে অনেক সময় বিনা সংকেতেই ঝড় এসেছে। আব্বা অনেক সময় বিচলিত হতেন। কিন্তু আম্মা আব্বাকে এতো সুন্দর হাসি দিয়ে সাহস যোগাতেন যে, তা ছিল অুলনীয়। সব ঝড়ই এসেছিলো অন্যের হিংসার কারণেই। আমি দেখেছি অনেক সময় আব্বা বেশ চিন্তিত হয়ে বাসায় আসতেন কিন্তু আম্মা তাঁর হাসি দিয়ে আব্বার হাতে নিজের হাতটি রাখতেন এবং সত্যিই সেই মুহূর্তে তিনি যেন কোথা থেকে আরও সাহসী হয়ে উঠতেন। আম্মা আরও বলতেন, যেহেতু তুমি কোন অন্যায় করো না, তোমার অসম্মান কেউ কখনো করতে পারবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো – যারা এই অন্যায় করেছে তারাই বিপদে পড়বে এবং সত্যি আমি দেখেছি তারাই বিপদে পড়েছেন।

আম্মা ত্যাগে বিশ্বাস করতেন। আমি দেখেছি তিনি পরিচিত বা অপরিচিত যে কারো যে কোনো বিপদে এগিয়ে যেতেন এবং যথাসম্ভব বিপদ মুক্ত করবার চেষ্টা করতেন। আব্বা আল্লাহর রহমতে ১৯৫৪ সাল থেকেই উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এবং বিদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদে উনাকে প্রায়ই বিভিন্ন দেশে যেতে হতো এবং নিমন্ত্রণ পেতেন সস্ত্রীক। কিন্তু আম্মা যেতেন না আমাদের জন্য। তিনি কখনো চাইতেন না উনার সন্তানরা অন্যের কাছে থাকুক। তিনি সর্বপ্রথম আব্বার সঙ্গে দেশের বাইরে গিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালে। তখন আমরা যথেষ্ট

বড় এবং যে শিক্ষায় আমরা বড় হয়েছিলাম সেই শিক্ষা থেকে যে আমরা বিচ্যুত হবো না তা তিনি নিশ্চিত হয়েই দেশের বাইরে গিয়েছিলেন।

আম্মার জীবনে এশটি নির্দিষ্ট স্থানে কখনো সংসার করতে পারেননি আব্বার চাকরিতে বদলীর কারণে। ঠিক বদলী নয়, যখন যে কোন সরকার দেশের প্রয়োজনেই আব্বাকে পাঠিয়েছেন, তখন তাঁকে যেতে হয়েছে। আম্মাও সানন্দে তা মেনে নিয়েছিলেন।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সরকারী বাসভবনেই সংসার করতে হয়েছিল। তিনি নিজের বাড়িতে ১৯৮০ সালে ঢাকায় (যে বাড়ির একতলার কাজ শেষ হয়েছিল ১৯৭৪ সালে) শেষ সংসার করেছিলেন। বাড়িতে যেদিন প্রথম প্রবেশ করেছিলেন সেদিন আম্মার আত্মতৃপ্তির যে প্রকাশ আমি উনার মুখে দেখেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু উপলব্ধিটি অনুভব করা যায়। যত সুন্দরভাবে মনের মত করে সাজানো যায়, সামর্থ্য অনুযায়ী ঠিক সেভাবেই সাজিয়েছিলেন নিজের বাড়িকে। তখন আম্মা বেশ অসুস্থও ছিলেন কিন্তু মনের জোরে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত তার নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করেই জগতের যত প্রকার মায়া ত্যাগ করে আমার বুকেই মাথা রেখে চলে গেলেন। তিনি যে কষ্ট করে আমাকে শেষবারের মত দেখার আকুল চেষ্টা করেছিলেন, সেই চাহনি আমি এযনও ভুলতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল আম্মা আমাকে তাঁর শেষ কল্যাণের স্পর্শ দিয়ে যেতে চাচ্ছেন এবং দিয়েও গেলেন ধীরে ধীরে চিরনিদ্রায় যাবার ঠিক প্রাক্কালে। আমি শেষ কল্যাণের স্পর্শ নিয়ে ফিরে এলাম, যখন নিজ হাতে আম্মাকে বনানীর কবরে শুইয়ে দিলাম।

যখন আমার ঘুম আসে না অথবা কোন বিপদে অথবা একাকীত্ব আমাকে পেয়ে বসে, তখন আমি উনার স্পর্শকে মনে হয় অনুভব করি এবং সকল অকল্যাণ থেকে মুক্তি পেয়েই এখনকার আমি।



# মা-মণির কিছু কথা

## সৈয়দা কমর জাবীন

ভাইবোনদের মধ্যে শেষ অবধি আমিই হয়তো মা-মণির বেশি কাছে থাকতে পেরেছি। দূরে অবস্থান করলেও মানসিক যোগাযোগটা রয়েছে চিঠিপত্র কিংবা ফোনালাপের মাধ্যমে। আমার ছোটভাই মেহরাবের জন্মের পর মা-মণি প্রায় অসুস্থ থাকতেন। ডায়াবেটিস তো ছিলই তার ওপর তখন তিনি টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। সে সময়ে আমাদের দুই বোনকে মেজচাচী অর্থাৎ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফের স্ত্রীর কাছে দেয়া হয়। এর আগে আমার জন্মের পর আমার দাদী নাকি একবার বলেছিলেন : আশরাফের তো বাচ্চাকাচ্চা নেই, আহসান ছোট মেয়েটিকে ওদের দিয়ে দিলে পারে। কিন্তু আমার আব্বা এটা অনুমোদন করেননি। পরে যখন আমরা দুই বোনই চাচীর বাসায় চলে গেলাম, তখন বাসা একেবারে খালি হয়ে গেল। ওদিকে আমার বড়বোন জিনাত বাসায় ফিরে যাবার জন্য হৈচৈ শুরু করে দিল। যাহোক, আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আব্বু-মা-মণির কাছে ফিরে এলাম। তখন আমরা গোপীবাগের একটি ছোট দোতলা টিনের বাড়িতে নিচেরতলায় থাকতাম। আর চাচী থাকতেন উপরতলার। পরে করাচি অবস্থানকালেও আমরা চাচা-চাচীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ছিলাম। কিন্তু যেখানেই থাকি মা-মণির কড়া নজর আমাদের স্বাস্থ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা, লেখাপড়া সবকিছুকে ঘিরে থাকতো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ। অল্প বয়সে আমার বড়বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়াতে আমি মা-মণির আরো কাছের মানুষে পরিণত হলাম। এটা বিশেষভাবে চট্টগ্রামে যাবার পর (১৯৬৭)। কেননা মা-মণি এবার একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেখানে। তবে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে রান্নার প্রধান কাজগুলো করিয়ে নিতেন। বলাবাহুল্য, এভাবে আমি রান্নায় যথেষ্ট ভালো হাত পাকিয়ে ফেললাম। এ সময়ে আমার আব্বুও আমাকে কিছু বিদেশী রান্না শিখিয়ে দিলেন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো ১৯৭০ সালের মাঝামাঝিতে। এ সময়ে আমার বিয়ের বেশ কিছু প্রস্তাব এলো। ড. কোরেশীর পক্ষে প্রস্তাব দিয়ে তাঁর মামা গ্রন্থাগারিক শামসুল আলম সাহেব বিলাতে চলে গেলেন। এদিকে

সাবেক গভর্নর জাকির হোসেন সাহেব ও তাঁর বন্ধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ইউ. এন. সিদ্দিকী সাহেব আব্বুর ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। আব্বু শেষমেষ জবাব দিলেন : 'কোরেশীকে আমি খুব পছন্দ করি। কিন্তু যেহেতু সে আমার বিভাগে কাজ করে, তাতে এ ধরনের সম্পর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।' ব্যাপারটি ছিল আরেকটু জটিল। আসলে এ সময়ে মা-মণিকে অনেকে ড. কোরেশীর সঙ্গে বিয়ের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। প্রথমত, চট্টগ্রামের শাশুড়িরা খুব দজ্জাল হয়ে থাকে। আর কোরেশীদের পরিবার একটু আপস্টাট ইত্যাদি। যাহোক, বিষয়টির সমাধা হলো আমাদের একমাত্র মামা সামিউজ্জামান খান ওরফে বাবলু আর ড. কোরেশীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিল্পী রশীদ চৌধুরীর হস্তক্ষেপে। রশীদ চৌধুরীর বর্ণনায়, কোরেশীর মতো ভালো ছেলে হয় না। যাহোক, মা-মণিকে অবশ্য পস্তাতে হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি আমার স্বামীকে আপন সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। নানা বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন।

বিয়ের পরেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনা-পর্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লাম। এ পর্যায়ে মা-মণি আমার রাঙ্গুনীয়ার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে শরণার্থী জীবন শুরু করলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও রামগড়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। পরে পহেলা বৈশাখের লগ্নে সাবরুম থেকে আগরতলায় চলে এলাম। থাকলাম নরসিংগড়ে। কষ্টকর কিছু সময় অতিবাহিত করে এলাম মুজিবনগর তথা কলকাতায়। সেখানে অল্প অর্থবিত্ত নিয়ে কয়েকজন পৌষ্যের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা মা-মণিকে করতে হতো। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও আব্বুর ছাত্র সহকর্মী, অনুরাগী অনেকে আসতেন এবং মা-মণি যথাসাধ্য তাঁদের আপ্যায়ন করতেন, টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন।

স্বাধীনতার পর আব্বু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য রূপে ধানমন্ডির ২ নম্বর সড়কের বিশাল বাড়িতে অবস্থান করলেও আর্থিক দিক থেকে ভয়ানক টানাপোড়েনে থাকতে হয়েছে। যাহোক, সেসব কথা। তবে অতি উদার মন-মানসিকতায়, পরোপকারের জন্য সদা-উন্মুক্ত হাত নিয়ে মা-মণি দিন কাটাতেন। সর্ব মুহূর্তে আপন পরিবারসহ আত্মীয়স্বজনদের মঙ্গলের জন্য সার্বিক প্রয়াসে থাকতেন তৎপর।

আমার বিয়ের দিন মা-মণি সম্ভবত সবচে দুঃখী মানুষটি রূপে বিরাজ করছিলেন। যাহোক, পরবর্তীতে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তিনি আমার স্বামীকে সবচে বেশি পছন্দ করতেন। একবার রাজশাহীতে এসে তিনি



আমাদের সঙ্গে থাকলেন। ড. কোরেশী রেকর্ড-প্লেয়ার বাজিয়ে তাঁকে তাঁর প্রিয় রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত শোনাতেন। তাঁর নির্দেশে সাহেববাজার থেকে খুব বড় একটি পদ্মার পাঙ্গাস মাছ এনে খাইয়েছিলেন।

মা-মণির চিরবিদায়ের ঘটনাটি আমাকে এখনো বিচলিত করে। রাজশাহীতে খবর পেলাম যে, মা-মণি অসুস্থ। আমার মেয়ে প্রসন্নাকে নিয়ে আমি ঢাকায় এলাম। ফেরার দিন মা-মণি হতাশার সুরে বলছিলেন : একটা মেয়ে আমেরিকায়, আরেক মেয়ে রাজশাহীতে, কোনদিন চলে যাবো কাউকে দেখতে পাবো না।

আমি রাজশাহী ফেরার পরদিন গভীর রাতে এক টেলিফোন। ড. কোরেশী নিচতলায় হিসাব-পরিচালক মাহবুব সাহেবের বাসায় গিয়ে ফোন ধরলেন। ঢাকা থেকে ফোন করেছিলেন ড. এ. আর. মল্লিক। তিনি জানালেন, মিনা (মা-মণির ডাক নাম) আর নেই। কোরেশী যেন সকালে আলী আহসানের অসুখের কথা বলে সবাইকে নিয়ে ঢাকা রওনা দেয়। তাই হলো। মা-মণির কথাও খাটলো। দুটি মেয়ে কেউ তাদের মা-মণির শেষ দেখা পেল না।

মা-মণির সঙ্গে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কেটেছে মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস রাউজানে নূতন সিংহের স্কুল, রাঙ্গুনীয়ায় শ্বশুরবাড়ি, রামগড় এসডিও বাংলো, আগরতলা রানীমা'র হোটেল, নরসিংগড় পলিটেকনিক হোস্টেল এবং কলকাতার গোবরা রোডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাসায় মা-মণির যে ধৈর্য্যশীল ও তেজস্বী রূপ দেখেছি তা অতুলনীয় আর অনুপ্রেরণাদায়ক।

# মানিকগঞ্জের মেয়ে, আমাদের 'মা-মণি'

## মাহমুদ শাহ কোরেশী

সে কি আর আজকের কথা! তিন দশকেরও অনেক অনেক আগে, যথার্থভাবে বলতে গেলে ১৯৭০ সালের শেষ দিনগুলোতে আমার পরিচিতা এক মহিলাকে 'মা-মণি' ডাকতে শুনলাম অনেককে। অনেক মানে আসলে আমার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী, তাঁর বড় বোন ও প্রকৌশলী স্বামী আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দুই ভাইকে। আবার কেউ কেউ যেমন ফজলে রাব্বি বা তাঁর ভাইবোনেরা তাঁকে ডাকছেন 'মামানি' বলে, যা প্রথমে আমার কানে 'মা-মণি' শোনাচ্ছিল। যাহোক, কোরাসে যোগ দিলাম আমি নিজেও। আমার শিক্ষক বা শিক্ষকতুল্য এবং তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, আমার পরম শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসানের সম্মানিতা স্ত্রী, সেই সময়ে আমার শাশুড়ি। ইতোপূর্বে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর ধরে তাঁকে দেখছি। কিন্তু অন্য সহকর্মীদের মত আমি অবশ্য 'ম্যাডাম', 'ভাবী', 'চাচী' বা 'খালাম্মা' বলে কখনো সম্বোধন করিনি। কথাই বলেছি খুব কম, কিছুটা দূর থেকে অবলোকন করেছি তাঁর সৌম্য-শান্ত মুখশ্রী।

পরে কাছে এসে দেখলাম তাঁর আশ্চর্য নরম-কঠিন ব্যক্তিত্ব। একদিকে স্নেহশীলা – যেন করুণার প্রস্রবণ, অন্যদিকে অনিয়ম-উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ, অটল, অবিচল। আবার চূড়ান্ত বিপদের দিনে ধৈর্যবতী, দানশীলা, পক্ষীমাতার মত সবাইকে আগলে রাখছেন আপন পক্ষপুটে।

দীর্ঘকাল রোগাক্রান্ত থেকেও স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতি-চেতনা ও সৌজন্যবোধ থেকে বিচ্যুত হননি কখনো। গান শোনার তাঁর প্রবল আগ্রহ, রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে তাঁকে বিশেষ বিশেষ গান শোনানোর সুযোগ হয়েছে বহুবার। তাঁর রচনা পাঠে এবং তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেও আনন্দ পেয়েছি অপার। সব মিলিয়ে এক অতুলনীয়া মহিলার সান্নিধ্য আমাদের অনেকের জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুখকর করেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর স্মৃতিসভায় এর আগেও একাধিকবার একটা কথা আমি বলেছি। আবার বলছি : আমার সাত দশকের যাপিত জীবনে আমি চার মহিয়সী মহিলার



সাক্ষাৎ পেয়েছি। একজন আমার মা যিনি শুধু আমার মা বলে নন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবার জন্য ছিলেন এক নির্ভরযোগ্য, অবিস্মরণীয় আপনজন। দ্বিতীয় এক বিদেশিনী, ভাষাবিদ অধ্যাপক মিস ক্রিস্টিন মোহরমান, ওলন্দাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, যিনি অযাচিতভাবে আমাকে ভাষাবিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক স্থায়ী কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়েছিলেন একদা। বহির্বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে ছোট্ট একটু জায়গা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন আমার জন্য এবং নিঃসন্দেহে অন্য অনেকের জন্যও। বলা প্রয়োজন, ১৯৬২ সালে প্যারিস, বোস্টন এবং ১৯৬৭ সালে বুখারেস্টে যখন তাঁকে দেখতাম তখন শুধু আমার নানীর কথা মনে পড়ত। ১৯৭৭ সালেও নিজে উপস্থিত হতে না পারলেও তিনি আমাকে রাজশাহী থেকে ভিয়েনার সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তৃতীয়জনও এক বিদেশিনী। তবে বঙ্গে সুধীসমাজের অনেকের কাছে স্বদেশিনীর চেয়েও অধিক সমাদৃতা। তিনি লীলা রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন বড় সমঝদার ও অনুবাদদক্ষ সাহিত্যিক। চতুর্থজন অবশ্যই বেগম কমর মুশতারী আহসান, আমাদের মা-মণি। তাঁর পিতৃপুরুষের অবস্থানের কথা মনে রেখে বলা যেতে পারে, মানিকগঞ্জের মেয়ে। কোন একটি ব্রসিউরে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ধামরাইয়ের পাইকপাড়া গ্রামে, মাতৃগৃহে। কথাটা সঠিক নয়। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, তিনি এই পৃথিবীর বুকে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায়, তাঁর পিতার কর্মস্থলে।

বেগম কমর মুশতারীর আব্বা কামরুজ্জামান খান জন্মেছিলেন মানিকগঞ্জের এলাচিপুর থানার দাদরক্ষী গ্রামের এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে। এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারের পূর্বপুরুষ পাঠান আমলে, ১৫০০ সালের দিকে এদেশে আসেন। তারপর কী করে তাঁরা এই দূরদূরান্ত এলাকায় বসবাস শুরু করেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে এই পরিবারের দাপট একসময় নিখিল বঙ্গে অনুভূত হতো। অনেক বড় বড় চাকুরে-কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার প্রভৃতি এই পরিবার থেকে বের হয়ে ঢাকা-কলকাতার রাজকর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

পূর্বপুরুষদের মধ্যে আমরা জানতে পেরেছি, আদালত খানের কথা। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মুনশী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুনশী মানে শুধু সচিব নয়, অধ্যাপকও বটে। তিনি আমাদের মা-মণির দাদার দাদা। তাঁর দাদাও ছিলেন একজন সমাজপতি।

এই পরিবারের কয়েকজন সুসন্তানের মধ্যে আশরাফুজ্জামান খান সৌভাগ্যক্রমে নবতিপর হয়েও আমাদের মধ্যে কর্মচঞ্চল রয়েছেন। চল্লিশের দশক থেকে তিনি একজন সুপরিচিত কথাসাহিত্যিক এবং নাট্যকার। দীর্ঘদিন ছিলেন বেতারের প্রধান কর্মকর্তা। তাঁর একমাত্র পুত্র আনিসুজ্জামান খান যিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ১৯৫৬-৫৭ সালে নির্বাচিত জয়েন্ট সেক্রেটারি। সেই কেবিনেটে আমিও ছিলাম ড্রামা ও এন্টারটেইনমেন্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেম্বার সিলেক্ট কমিটি। আনিস পরে সিএসপি হন এবং আমি তাঁকে রাজশাহী বিভাগের কমিশনাররূপে কর্মরত দেখেছিলাম। আশরাফুজ্জামান সাহেবের অন্য ভাইদের মধ্যে বেবী জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক, বিবাহসূত্রে তিনি বিখ্যাত লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আত্মীয়। আরেক ভাই আমীরুজ্জামান খান ছিলেন টেলিভিশনের মহাপরিচালক, আরেক আত্মীয়-ভ্রাতা আতিকুজ্জামান খান যিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান এবং পরে কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার। এই পরিবারের দুই কন্যা একসময়ে আমাদের গানের ভুবনে ছিলেন সুপরিচিত। তারা হলেন বিলকিস নাসিরুদ্দীন ও রোকাইয়া ইসলাম (রোজী)। দু'জনেই রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত ও গজলে দক্ষ এবং ১৯৫০-৬০ এর দশকে বেতারের খ্যাতনামা শিল্পী।

কমর মুশতারীর পিতা বিয়ে করেছিলেন ধামরাইয়ের পাইকপাড়াস্থ আরেক বিখ্যাত খান পরিবারে। সেই পরিবারের খ্যাতি ঢাকার ব্যবসায়ী জগতে ঐতিহ্যবাহী আর্ট প্রেস, পদ্মা প্রিন্টার্স, ফুজি কালার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলোর কর্ণধার খান মুহাম্মদ ইকবাল, খান মুহাম্মদ আমীর, খান মুহাম্মদ জামান, খান মুহাম্মদ ইমরান প্রমুখ দেশে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। সেখানে মা-মণি হলেন সুফিয়া বেগমের কন্যা মিনা। তাঁর একমাত্র ভ্রাতা সামিউজ্জামান খান ওরফে বাবলু পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এক অতি জনপ্রিয় ছাত্র। বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মের কারণে তিনি করাচি, সিলেট ও ঢাকায় অবস্থান করেন। সর্বশেষ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের সচিব ছিলেন রাজধানীতে। ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্পবয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত এই জটিল ব্যাধিতে আমাদের মা-মণিকেও সারা জীবন নিরতিশয় কষ্ট ভোগ করতে



হয়েছে এবং অকালে ছেড়ে যেতে হয়েছে সুখের সংসার (১৭ জানুয়ারি, ১৯৮৩)।

মা-মণির আব্বা কামরুজ্জামান খান যখন হাওড়ার প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা, তখন নবীন, প্রতিভাবান কবি ও অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের কর্মকর্তা সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে তাঁর শাদী মোবারক অনুষ্ঠিত হয় (৭ জুলাই, ১৯৪৬)। তাঁরা তখন অবস্থান করছিলেন বাউরিয়ায়। হিন্দু, খ্রিষ্টানসহ কলকাতার সংস্কৃতি জগতের অনেক ব্যক্তিত্ব সেই অনুষ্ঠানে শরিক হন। বিয়ের অল্প পরেই কিশোরী কমর মুশতারীকে সংসারের নানা ঝামেলা পোহাতে হয়। তাঁর স্বামীর পরিবার ছিল স্বল্প আয়ের, আবার অনেক ভাইবোনসহ ধর্মভীরু এবং রক্ষণশীল।

কলকাতা থেকে ঢাকা বদলী, দেশভাগ, দাঙ্গা, স্বামীর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি, করাচি গমন, আবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন – এগুলো সব দশ-বারো বছরের মধ্যে ঘটেছিল। বিয়ের আগে তাঁর যে গান শেখার শখ ছিল সেটা গেল, সাহিত্যকর্মের ঝোঁক ছিল সেটা কমল। হাওড়ায় পড়াশোনা করলেও মা-মণি মেট্রিক পাশ করেছিলেন (১৯৪৪) বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল থেকে। বিয়ের সময়ে তিনি লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছিলেন। কিছু আগে থেকে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন এবং স্থানীয় হাতে-লেখা পত্রিকায় তাঁর গল্প বেরুতে থাকে। ১৯৪৬ সালে 'পূর্বাপর' নামে তাঁর একটি গল্প মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান লক্ষ্য করেছেন যে, বিবাহপূর্ব কালে রচিত গল্পগুলো যেখানে 'রোমান্টিক আবহে আচ্ছন্ন' এবং যৌবন শুরুর 'উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ'। যদিও এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে রয়েছে 'পারিবারিক ও গৃহগত সৌজন্যের রূপকল্প', সেখানে বিবাহের পরে লেখা গল্পে দেখা যাচ্ছে, 'লেখিকা সংসারকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এখানে একটি বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে যে, সংসারই সমস্ত সৌভাগ্যের হেতু। আগের লেখার উচ্ছ্বাস এখানে নেই কিন্তু বিবাহিত প্রেমের নির্ভরতা এবং পবিত্রতার কথা এখানে আছে।' (দ্রষ্টব্য কমর মুশতারীর ছোটগল্প *সেতুবন্ধন*, পৃষ্ঠা ৭-৮)।

১৯৬৪ সালে বেগম মুশতারীর প্রথম গল্পগ্রন্থ *পূর্বাপর* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক রূপে নামোল্লিখিত হয়েছে বড় মেয়ে সৈয়দা নাজ কমর-এর, পরিবেশক নওরোজ কিতাবিস্তান। এই বইতে রয়েছে ৮টি গল্প। এর মূল্যায়নের জন্য আমরা আবার অধ্যাপক আহসানের শরণাপন্ন হব।

তিনি মন্তব্য করেছেন, 'গল্পগুলো পাঠ করলে লেখিকার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। অত্যন্ত সহজ ভাষায়, একটি সততায় এবং বিশ্বাসে তিনি এ গল্পগুলো লিখেছেন। গল্পগুলোতে মূলত কোন গল্পাংশ নেই। কিন্তু প্রতিটি গল্পেই জীবনযাপনের কিছু অভিজ্ঞতা এবং কিছু মুড ধরা পড়েছে।'

তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *অশান্ত মন শান্ত হল*। প্রখ্যাত প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁর আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে বইটি প্রকাশ করেছেন ১৯৮১ সালে। এই বইতে রয়েছে ৬টি গল্প। সংসার জীবনে রমণীর কল্পনা এবং বাস্তবের সঙ্গে যে বিরোধ, তাই এখানে চিত্রিত হয়েছে। তবে ব্যর্থতা এবং বেদনার ভাবটিই বেশি মূর্ত হয়েছে। অধ্যাপক আহসানের মতে, 'লেখিকা বলতে চেয়েছেন, যা ঘটে বাস্তবে, জীবনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি নেই। কিন্তু তাকেই আমাদের মেনে নিতে হয়, এটাই নিয়তি।'

আমরা লক্ষ্য করেছি, বইটিতে লেখিকার ভাব ও ভাষার একটা যথার্থ সমীকরণ সাধিত হয়েছে। সমকাল নিয়ে লেখা হলেও লেখায় অন্যের অনুকরণমুক্ত জীবন ও জগত সৃষ্টি হয়েছে। নানা কারণে বেগম মুশতারী তাঁর সাহিত্যকর্মকে চূড়ান্ত সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারেননি। যে শান্তি, সহজতা এবং সৌহার্দ্য সর্বমুহূর্তেই লেখিকার কাম্য ছিল বলে তাঁর স্বামী অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেই পরিবেশ সমসাময়িক জীবনে তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর দুটি পাণ্ডুলিপি এখনও অপ্রকাশিত। একটি হল *শরণার্থী জীবনের কথা* এবং অন্যটি রান্না বিষয়ক বিচিত্র তথ্যগ্রন্থ।

জনকল্যাণে নিবেদিতচিত্ততা ছিল বেগম কমর মুশতারীর চরিত্রের একটি প্রধান দিক। তাঁর দানে উপকৃত হয়েছে এমন অনেক নরনারী আমাদের সমাজে এখনো বিচরণ করছেন। ১৯৭৬-৭৭ সালে প্রায় দুটি বছর তাঁর সুন্দর, সুখের জীবন কেটেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহার চত্বরে, উপাচার্য ভবনে। সে এক বিশাল রাজবাড়ী। চারদিকে ফুল ও ফলের বাগান আর মাছভরা পুকুর। তিনি প্রাপ্ত ফুল, ফল, সবজি ও মাছের বেশির ভাগ বিলি করতেন পিয়ন, চাপরাশি, কর্মচারী, কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের মধ্যে। বিশেষ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নানা কারণে দুরবস্থায় দিনযাপন করছিলেন তাদের পরিবারকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। মহিলাদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি 'উদিতা' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরাগী মহিলারা তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী রূপে। মৃত্যুর পর তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য ১৫ মার্চ, ১৯৮৩ সালে এর সহ-সভানেত্রী ডা. লুৎফুন্নেসা কাদের ১০



মার্চ, ১৯৮৩ তারিখে একটি মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন। পরে এটি রাজশাহী মহিলা ক্লাবে রূপান্তরিত হয় এবং সেখানে কমর মুশতারী স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেগম মুশতারীর তিরোধানের কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় সৈয়দ আহসানের *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* গ্রন্থটি। লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন অল্পক'টি বেদনাবিদ্ধ শব্দসমষ্টিতে – 'আমার স্ত্রী/কমর মুশতারীকে/যিনি আর নেই'।

অল্পদিন পর সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্টের অধীনে বেগম মুশতারীর নামে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার চালু করা হয়। এতদুপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে অধ্যাপক আহসান লেখেন –

> '১৯৮৩ সালের ১৭ জানুয়ারি আমার স্ত্রী কমর মুশতারীর মৃত্যু হয়। জীবিতকালে তিনি সংসার জীবনের বাইরে সকল সময় মানুষের সঙ্গে মমতার বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অধিগম্যতা ছিল এবং তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে তিনি আমার সঙ্গিনী হয়েছিলেন। এছাড়াও আমার সঙ্গে ভারত, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে।
>
> আমার স্ত্রী কমর মুশতারীকে স্মরণ করে আমি পুরস্কার প্রবর্তন করেছি। সেই পুরস্কার 'কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের খ্যাতনামা সকল মহিলা সাহিত্যিক এই পুরস্কারে ভূষিত হয়ে আসছেন। ১৯৮৩ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। যাঁরা এই পুরস্কারে ভূষিত হতে পেরেছেন তাঁদের কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁদের সাহিত্যের পরিধি ব্যাপকতা পাক ও দিনে দিনে শ্রী বৃদ্ধি হোক – এই দোয়া রইল।'
>
> (স্বাক্ষর – সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৯৪)

এখানে পুরস্কার কমিটি যাঁদের নিয়ে তিনি গঠন করেছিলেন তাঁদের নাম দিচ্ছি – কবি জাহানারা আরজু (সভাপতি), বেগম রাবেয়া খাতুন, বেগম রিজিয়া রহমান, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, বেগম নাসরিন কোরেশী, সৈয়দ আলী কায়েম, বেগম রিতা কায়েম, মিসেস ফজলে রাব্বি, জনাব ফজলে রাব্বি, বেগম জুবাইদা গুলশান আরা, বেগম রোকেয়া সুলতানা (সদস্য) ও সৈয়দ আলী-উল-আমীন (সদস্য-সচিব)। এ পর্যন্ত যাঁরা কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন এবার তাঁদের তালিকা দিচ্ছি – বেগম রাজিয়া খান আমীন (১৯৮৩), বেগম রাবেয়া খাতুন (১৯৮৪), বেগম জুবেদা গুলশান

আরা (১৯৮৫), বেগম মাফরুহা চৌধুরী (১৯৮৬), বেগম সেলিনা হোসেন (১৯৮৭), বেগম রিজিয়া রহমান (১৯৮৮), বেগম শামস রশীদ (১৯৮৯), বেগম মকবুলা মঞ্জুর (১৯৯০), ড. জাহান আরা (১৯৯১), বেগম জাহানারা আরজু (১৯৯৩), ড. মালিহা খাতুন (১৯৯৪), বেগম সম্পাদিকা নূরজাহান (১৯৯৫), বেগম হোসনে আরা শাহেদ (১৯৯৬), বেগম ফাহমিদা আমিন (১৯৯৭), শ্রী ঝর্নাদাশ পুরকায়স্থ (১৯৯৮), ড. রাবেয়া মঈন (১৯৯৮), বেগম রাজিয়া হোসাইন (২০০১), বেগম মীনা আজিজ (২০০২) এবং বেগম দিলারা মেজবাহ (২০০৩)। এছাড়া আরো কয়েকজনের নাম পাই পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে কিন্তু কোনক্রমের জন্য তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। যেমন ড. খালেদা সাহাবুদ্দিন, বেগম নয়ন রহমান, বেগম ফরিদা হোসেন, বেগম হেলেনা খান, বেগম দিলারা হাশেম প্রমুখ।

জীবিতাবস্থায় উৎসর্গীকৃত কবিতা ছাড়াও মৃত্যুর পর অন্তত তিনটি রচনায় সৈয়দ আলী আহসান তাঁর স্ত্রীকে স্মরণ করেছেন। প্রথমে রয়েছে ১৯৯০ সালে স্বাক্ষরিত একটি ছোট কবিতায়, একটি ক্ষুদে নিবন্ধ কমর মুশতারীর ছোটগল্প যার কিছু উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছি। তৃতীয়ত, নিজের মৃত্যুর কিছু পূর্বে 'প্রান্তিক' শীর্ষক প্রবন্ধে রয়েছে এর মর্মস্পর্শী স্বীকারোক্তি :

'আমার মার মৃত্যুর পর যিনি আমার জীবনকে আমাদের পরিপূর্ণতায় ধরে রেখেছিলেন তিনি আমার স্ত্রী। সংসার জীবনে তিনি আমার চালিকাশক্তি ছিলেন এবং বিশ্বাস ও চিন্তার জগতে তিনি আমার প্রবল সহায়ক শক্তি ছিলেন। কর্মজগতে বহু বিরোধী শক্তির সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রীর কারণে আমি কখনও বিচলিত বোধ করিনি। তিনি শুধু একটি কথাই বলতেন – তুমি তো অন্যায় কিছু করনি, সুতরাং তোমার ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। অন্যায় শক্তির দম্ভ আমাকে কখনও দুর্দশায় নিয়ে যেতে পারেনি। এখন তিনি নেই। তাঁর অভাব আমি প্রত্যহ অনুভব করি। এ মুহূর্তে জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে শুধু আশ্বস্ত হই একথা ভেবে – 'আমারও বিদায়ের সময় হয়ে এলো। নিশ্চয়ই অপার জলধির অপর প্রান্তে, একটি প্রত্যয় এবং বিশ্বাসের শাশ্বত দিবস আছে।'

বেগম কমর মুশতারীর মতো স্বল্পালোচিত অথবা একেবারেই অনালোচিত আমাদের অনেক সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। একবার আলোচনায় অবতীর্ণ হলে বোঝা যায়, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে এর মূল্য কী। এক্ষণে আমার স্মরণে আসছে তাঁর শেষ



জন্মবার্ষিকী (১১ অক্টোবর ১৯৮২) আর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *অশান্ত মন শান্ত হল*-এর প্রকাশনা উপলক্ষে তাঁর বাসভবনে আয়োজিত একটি অনন্যসাধারণ অপরাহ্নের কথা, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, আবু রুশদ মতিন উদ্দিন, সৈয়দ আবদুস সুলতান, মহিউদ্দিন আহমদ (প্রকাশক), মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম প্রমুখ বহু সাহিত্যসেবী। দুর্ভাগ্যবশত সেই প্রকাশনা উৎসবের বিবরণ বা আলোচনার ধারাভাষ্য লিখিত বা প্রকাশিত হয়নি। তাই এসবের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আমরা বেগম কমর মুশতারী আহসান সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র রচনার উপসংহার টানব। তবে তার পূর্বে তাঁর স্মরণে রচিত সুকবি জাহানারা আরজু'র 'সেতুবন্ধনে বেঁধে রাখতে চাই' কবিতাটির প্রথম কটি পঙক্তি এখানে পরিবেশন করতে চাই :

'এমন কিছু কিছু মুখ আছে দেখলেই সহসা
মায়ের মুখটাই মনে পড়ে
এমন কিছু কিছু মুখচ্ছবি হৃদয়ের পটে
জলরঙে আঁকা হয়ে যায় –
যে সান্নিধ্য মায়ের মত সস্নেহ আদর লুকানো
যে অভয় ছায়ায় দু'দণ্ড দাঁড়াতে ইচ্ছা জাগে
তেমন এক ব্যক্তিত্ব তিনি, যতটুকু দেখেছি তাঁকে
আপন থেকে আপনতর হয়েছেন তত।'

# বন্ধন

বনেদি ঘর। পীর বাড়ি। পূর্বপুরুষেরা সবাই প্রায় পীর ছিলেন। বর্তমানেও এ বাড়ির ছেলেমেয়ে, বউ এমনকি জামাইরা পর্যন্ত সবাই দীনদার। বছর ঘুরে ফিরে ওরশ শরীফ চলছে। মহল্লার লোকেরা বলে, এ বাড়ি নাকি আগুনের ঘর। এদের দোয়াতে আজও অনেক ফল হয়। আবার কখনও যদি কোন লোক এদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে তবে সঙ্গে সঙ্গে নাকি কোন ক্ষতি হয়ে যায়। এই কলুষিত পৃথিবীতে আজও এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখলে চেনা যায়। এরা যেন সবার সঙ্গে থেকেও নিজেকে সর্বদা বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত।

এ বাড়ির ছোট ছেলে লুবান এবার এম.এ দিচ্ছে বাংলায়। এই বিষয়টির প্রতি তার আগ্রহ এ বাড়ির ইতিহাসের দিক থেকে একটি মস্ত ব্যতিক্রম। কিন্তু তা সত্য হয়ে উঠেছে তার জীবনে। কিন্তু এর পেছনে একটি ছোট ইতিহাস আছে যা তার পিতার মৃত্যু, মাতৃস্মৃতি ও বড় ভাবীর অপত্যস্নেহের সাথে জড়িয়ে বড় করুণ হয়ে লুবানের জীবনের সাথে মিশে আছে। লুবানের এতটুকু জীবনের সেই বিচিত্র কাহিনীটি তাকে বড় উদাস, একাকী করে তুলেছে। তার নৈঃসঙ্গের পীড়ার মধ্যে তার কত যে চোখের জল মিশে আছে সে সংবাদ তার বড় ভাবী ছাড়া আর কেউ জানত কিনা সন্দেহ।

লুবানের বড় ভাবী যখন বধূ হয়ে এলো তখন লুবান মাত্র চার বছরের। তখনও সে বোতলে করে দুধ খায়। এক বৎসর পরে বড় ভাবীর কোলে নওশাদ এলো। নওশাদও বোতলে দুধ খেতো বলে লুবানের লজ্জা করতো বোতলে দুধ খেতে। কপাটের আড়ালে লুকিয়ে বোতল নিয়ে দুধ খেতো লুবান। মা মাঝে মাঝে লজ্জা দিতেন। আর বলতেন, ছি! তোমার ভাই কি বোতলে দুধ খায়। এবার বোতল ছেড়ে গেলাস ধরো। ছোট ছেলে লুবান কি বুঝলো কে জানে। বোতল ছেড়ে গেলাসে দুধ খেতে আরম্ভ করে দিলো। আর আধ আধ স্বরে বলতো, 'আমি নওশাদের ছোট্ট চাচা'।



লুবান স্কুলে ভর্তি হয়েছে। নিরীহ, শান্ত ছেলেটি অল্পদিনেই সবার প্রিয় হয়ে উঠলো। পড়াশোনাতে মেধাবী ছাত্র লুবান, পরীক্ষা দিয়েই প্রথম স্থান পেল ক্লাশে। শিক্ষকেরা তাকে বেশ আদর করতেন। সবাই জানতো লুবান নামকরা পীর বাড়ির ছেলে। লুবান নিয়মিত স্কুলে যায়। খেলাধুলা করে, কখনও সমবয়সী ভাই সাব্বিরের সঙ্গে বসে নানা গল্প করে। মাঝে মাঝে বলে – সেও নানা-দাদার মতো একজন পীর হবে।

বাবার সঙ্গে লুবানের সম্পর্ক খুবই কম। গুরুগম্ভীর মানুষ ছিলেন লুবানের বাবা। শুধু যখন আছরের নামাজ পড়ে তিনি প্রতিদিন নিজের কামরাতে বসে কোরান পড়ে শোনাতেন, তখন সবাই একে একে জড়ো হতো তাঁর ঘরে। লুবানের মাও তাঁর পাশে বসে একাগ্র মন নিয়ে শুনতেন। আর কাছে কোল ঘেঁষে থাকতো লুবান। বাবা যখন বড় বড় অলিওয়াল্লাদের নানা কাহিনী বর্ণনা করে শোনাতেন, তখন লুবানের মন যেন হারিয়ে যেত তাদেরই মধ্যে। ভাবতো, কবে বড় হবে, কবে সেও এমনি একজন পীর হয়ে সবার শ্রদ্ধা পাবে।

মনে পড়ে লুবানের প্রথম মুরীদ হওয়ার কথা। লুবানের বাবা তখন শয্যাশায়ী। তিন মাস ধরে যমে-মানুষে যেন টানাটানি। আগের দিন থেকে জ্ঞান নেই বললেই চলে। বাড়িতে সবাই এসেছে। বাবার মুখে বিষাদের ছায়া, কখন কী হয়।

লুবানের মা অনেক মৃত্যু দেখেছেন। তিনি ছেলেদের ডেকে বললেন, আজ তোমরা বাইরে যেও না। আর সবাইকে সংবাদ দাও যে তোমার বাবার অবস্থা ভাল নয়।

মেয়েরা, বউরা অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগল। লুবানের বাবাই যে এ সংসারের সব। লুবানের মা সর্বদা অসুস্থ থাকতেন বলে একাধারে মা ও বাবার সকল কর্তব্যই যে তিনি পালন করে গেছেন এতকাল। এতবড় সংসার, এতগুলি ছেলেমেয়ে সবাইকে শৃঙ্খলার সাথে মানুষ করে গেছেন। শত দুঃখে, বিপদেও বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে থেকেছেন। কারও উপর এতটুকু আঁচড় লাগেনি কোনদিন। লুবানের বড় ভাবী, বড় ভাই সবাই এসেছেন বিদেশ থেকে। লুবানের আব্বা কন্যা-স্নেহে বড় বউকে দেখতেন। অনেকটা নির্ভর করতেন তার উপর। বড় বউও নিজের বাবার সঙ্গে তফাৎ করে দেখেননি শ্বশুরকে। শাশুড়িকেও ভক্তি করতেন। শ্বশুরের প্রতি তার টান ছিল যেন বেশি। আজ যখন শ্বশুর সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন স্থির থাকতে পারে না এ বাড়ির বড় বউ। মনে হচ্ছে যেন

মাথার উপর থেকে ছায়া সরে গিয়েছে। উত্তপ্ত সূর্যের তাপে সে যেন এখনই গলে যাবে। এমনিতেই আজ অনেক বছর থেকে নানা অসুখে ভুগছে সে। লুবানকে কাছে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন বড় ভাবী।

ভরা মগরেবের সময়। বাড়ি ভরা লোক। আত্মীয়-স্বজন সবাই এসেছে। এ বাড়ির সবার উপর যিনি ছিলেন তার খলিফা ওমর সাহেবও অকস্মাৎ এসে হাজির হয়েছেন। তিনি বুকে হাত বুলিয়ে নানান সব দোয়া পড়ছেন, যাতে লুবানের আব্বার কষ্ট না হয়। ছেলেরা সবাই কেউ কানে আল্লাহর নাম দিচ্ছে, কেউ কোরান পড়ছেন। সবারই চোখে পানি। কেঁপে কেঁপে উঠছে কোরানের আয়াত। একটু দূরে লুবানের মা বসে বুক চেপে নীরবে কাঁদছিলেন। স্বামীর কষ্ট আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। কান্না চেপে অতি ধীরে বললেন, পীর সাহেব, ওঁর বুকে আয়তুল কুরছি লিখতে থাকেন। আহছানির সঙ্গে জান যাবে।

চমকে উঠলো বড় বউ। কত ধৈর্য্য তার শাশুড়ির। এত বড় বিপদের দিনে সতী সাধ্বী না হলে কি কোন নারী এত ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে পারতেন। চোখের পানি যেন তারও নিমিষে শুকিয়ে গেল। দু'হাত তুলে খোদাকে ডাকলেন, 'খোদা আব্বাকে শান্তি দাও'।

রাত দশটায় লুবানের বাবা ইন্তেকাল করলেন।

লুবান এই প্রথম আঘাত পেল জীবনে। চোখের সামনে মৃত্যুকে দেখে যেন মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় তার অনেকটা কেটে গেল। তার বাবাকে শান্তিতে মরতে দেখে বুঝতে পারলো নেকবখত লোকেরা শান্তিতেই ইন্তেকাল করেন। এই দুনিয়ার মায়া থেকে যেন মন তার অল্প বয়সেই দূরে চলে গেল। আল্লাহর পথে থেকে সমস্ত কাজ করে একদিন বাবার মতই যেন শান্তিতে আল্লাহর কাছে যেতে পারে তার জন্য নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তারপরই পীরের মুরিদ হলো লুবান। একদিকে পড়াশোনা এবং অন্যদিকে আল্লাহর এবাদতে নিয়োজিত করলো নিজেকে।

২.

বিকেলের রোদ ঢলে পড়েছে। কৃষ্ণচূড়ার ফুলের স্তবকে রোদের ছোঁয়ায় আগুন লেগেছে যেন। লুবান বসে কি লিখছিল, বুঝি কবিতাই এসেছিল মনে। এমনি সময় ধীর পদক্ষেপে তার পেছনে এসে দাঁড়ালো পাপড়ি। নরম গলায় বললো, লেখায় এমনি বিভোর। আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে



আছি। একবার টেরও পেলেন না। কী লিখলেন? নিশ্চয় কোন প্রেমের কবিতা ...।

হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ালো লুবান। বললো, সত্যি আমি জানতে পারিনি। প্রেমের কবিতা আমি লিখিনি। এটা যে ধরনের কবিতা ... এই কবিতা তোমার ভাল লাগবে না।

পাপড়ি বি.এ ক্লাশের ছাত্রী। কিন্তু কবিতা বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল না কখনো। লুবানের সাথে পরিচয় হওয়ার পর তার কাছে এই চরিত্রটি বড় বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে বারবার। লুবানের কবিতার প্রতি আগ্রহের কারণ ছিল। শান্ত চোখ মেলে, কিন্তু স্বরে যথেষ্ট অধিকার রেখে বললো, তা হোক, দেখি কী লিখলেন। তারপর একটু থামলা। বললো – আপনি যা গম্ভীর মানুষ! প্রেমের কবিতা আপনার দ্বারা লেখা সম্ভব নয়। ভার্সিটির কোন মেয়েই ভয়ে আপনার কাছে ঘেঁষে না। বলে, আপনি নীরস, কাঠখোট্টা স্বভাবের ছেলে। নেহাৎ ভাইয়া আপনার বন্ধু বলেই না আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হলো। আমিও কিন্তু খুব ভয় করতাম আপনাকে। মিশে দেখলাম ভয় পাবার কিছু নেই। সত্যি বলতে কি এই গাম্ভীর্য আপনার পোশাকী। আসলে মানুষ হিসাবে আপনি খুবই ভাল। এতগুলো কথা যেন পাপড়ি বলতে চায়নি। অজানিতভাবেই কথাগুলি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হলো, ছিঃ লুবান না জানি কি ভাবছে তাকে। লুবান সবসময় দূরত্ব বজায় রেখে মেশে। তার পক্ষে এত ঘনিষ্ঠতা দেখানো ভাল হয়নি। লুবানও যেন চমকে উঠেছে পাপড়ির এসব কথায়। পাপড়ি কেমন করে জানল তার মনের কথা?

আজ এক বছর ধরে এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তার দিনগুলো কেটেছে। কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছিল না লুবান তার। একদিকে আল্লাহর পথে উন্নতি করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে দুনিয়ার লালসার হাতছানি! কিন্তু আল্লাহর পথে থাকতে গেলে পার্থিব অনেক আনন্দ থেকে মানুষকে দূরে থাকতে হয়। সংযমের সঙ্গে চালিত করতে হয় নিজেকে। বন্ধুবান্ধবরা যখন সিনেমার গল্প করে, লুবানের মনও চায় যে সেও একবার সিনেমা দেখে আসে। কিন্তু মগরেবের নামাজ কাজা হয়ে পাছে কোন ক্ষতি হয় এই ভয়ে পারে না। পীর হয়ে যান অসন্তুষ্ট। তাই আর যাওয়া হয়ে উঠে না। মাকেও তার বড় ভয়। কিন্তু এত অল্প বয়সে আল্লাহর কাজ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠে লুবান। অনেকক্ষণের নীরবতা ভেঙ্গে ধীর কণ্ঠে লুবান বললো, পাপড়ি, তুমি ঠিকই ধরেছ। বাইরের দিক দেখে সবাই আমাকে ওরকমই ভাবে। কিন্তু সত্যিই

আমি বড় দুর্বল, বড় অসহায়। তারপর আরো যেন সে ডুবে যেতে চায় নিজের মধ্যে। বলে, আমার মা! তিনি চান আমি তাঁর বাবার মতো একজন পীর হয়ে ওঁর আশা পূর্ণ করি। কিন্তু ... না থাক। চল, পাপড়ি উঠা যাক। সন্ধ্যা হয়ে এলো। নামাজের আর দেরী নেই। পাপড়ি আর কিছু না বলে লুবানের সঙ্গে পা বাড়াল। বুঝতে পারলো, লুবানের মন আজ ভাল নেই। গেটের সামনে এসে দু'জনে দু'দিকে চলে গেল। কারও মুখে আজ কথা ফুটল না।

যথারীতি এম.এ পাশ করলো লুবান। ফার্স্ট ক্লাশ পাবে আশা ছিল। কিন্তু কয়েক নম্বর কম পাওয়ায় আর হলো না। মুষড়ে পড়লো লুবান। বিরোধ আবার জাগে মনে। কিছু এবাদত বাদ যায়। নামাজ পড়ে অনেকক্ষণ পীরের দেওয়া নানা কাজ সে নিয়মিত করতো। এখনও যে কিছু করে না, তা নয়। কিন্তু মনের সে তাগিদ যেন আর পায় না।

মাঝে মাঝে মনে হয় মাকে সব খুলে বলে। কিন্তু সংকোচ লাগে। মার এতবড় আশা ভেঙ্গে দিতে পারে না। মা বড় আশা করে আছেন, একদিন না একদিন তাঁর লুবান তার বাবার মতই একজন অলিয়াল্লা হবে। তিনি লুবানকে গর্ভে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর বাবার মাজার শরীফের কাছ দিয়ে একফালি চাঁদ উঠেছে।

সকালে উঠে নামাজ শেষ করে দোওয়া চাইলেন। এবার যে ছেলে হবে সে যেন তার বাবার মতই হয়। এ স্বপ্নের কথা সে তার মার মুখে শুনেছে।

মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিগলিত কণ্ঠে বলেছেন, 'লুবান, আমার আশা পূর্ণ করিস বাবা। দুনিয়ার পাকচক্রে পড়ে নিজের রাস্তা ভুলিস না। মনে রাখিস, একদিন সবাইকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। সেইদিন যাতে হাসিমুখে যেতে পারিস এই দোয়াই করি তোকে।'

আবার অস্থির হয়ে উঠে লুবান। তবে কি পীর সাহেবকে খুলে বলবে সব। না না, সে একেবারেই অসম্ভব।

বলতে পারতো পাপড়িকে। কিন্তু চঞ্চলা পাপড়ি এসব গভীর আধ্যাত্মিক কথার কোন মর্মার্থই বুঝবে না। হয়তো ভাববে, লুবান প্রকৃতিস্থ নয়।

লুবান, মাথাটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলো!



৩.

আরও কয়েক মাস কেটে যায়। লুবানের মা মৃত্যুশয্যায়। লুবানের একমাত্র সান্ত্বনা যে, মা বেঁচে আছেন। সে পথ হারাবে না কোনদিন, কিন্তু আজ মাও তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কঠিন রোগে ভুগছিলেন লুবানের মা আজ বহুদিন।

সকাল এগারোটা। লুবানের মা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। বড় ভাবী, সেজোভাবী শুধু কাঁদছে। লুবান মার সামনে বসে কোরান পড়ে যাচ্ছে, কোন দিকে যেন তার খেয়াল নেই। সেজো ভাই ও বোন লায়লার কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজে আছেন লুবানের মা।

বড় ছেলে শওকত মাথায় ও বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সবাই অভিমান করে বলতো, লুবানের মা নাকি বড় ছেলে শওকত আর লুবানকেই ভালবাসতেন বেশি। শওকত আজ যেন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। বাবা গেছেন আজ অনেক বছর। মা তাদের আগলে রেখেছিলেন। দশটি সন্তানের মা তিনি। ভাইবোনদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য হলেই মা তাদের সমাধান করে দিতেন। কোন পরামর্শের প্রয়োজন হলেও মার কাছেই ছুটে চলে আসতো সবাই। এমন একটি চরিত্র যেন সহজে চোখে পড়ে না। অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন লুবানের মা। বার্ধক্যেও সে সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। নুরানী আলোর প্রতীক তিনি। একবার তার দিকে তাকালে মন যেন জুড়িয়ে যায়। এতো অসুস্থতাতেও লুবানের মাকে দেখা যায় একটানা নামাজের জায়নামাজেই বসে থাকেন। লুবান ঘুম ভেঙ্গে মাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'মা শরীর খারাপ নিয়ে কেমন করে রাত জেগে এবাদত করেন? কষ্ট হয় না মা?'

স্নিগ্ধহাস্যমুখে উত্তর দেন মা, 'নারে আমার কষ্ট হয় না। বাবা যে এসে দেখা করেন। কত কথা হয়।' এসব কথার অর্থ লুবান বুঝতো না। অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতো মার দিকে।

কয়েকবার কেঁপে কেঁপে উঠে তাঁর শরীর। তারপর মাথাটা ঢলে পড়ে লায়লার কোলে। 'মাগো' বলে জড়িয়ে ধরে লায়লা। সবাই দিশেহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ে। মুখে কারও শব্দ নেই। পীর বাড়ির কান্নার শব্দ শোনা যায় না। শুধু বেদনায় অধীর হয়ে যায় সবাই। লুবান ছুটে চলে যায় নিজের ছোট্ট ঘরে। টেবিলের উপর মাথা রেখে কেঁদে নিজেকে হাল্কা করতে চায়। এ তুমি কী করলে খোদা! আমার এই আশ্রয়টুকুও নিয়ে গেলে এখন কী করবে লুবান। মগরেবের শেষে লাশ দাফন দেওয়া হলো। মার ইচ্ছা ছিল, তাঁকে যেন তাঁর বাবার মাজার শরীফের কাছেই কবর দেওয়া হয়।

ছেলেরা, জামাইরা তাঁকে নিয়ে গেল গ্রামের বাড়িতে। মাজারের কাছে লুবানকে সবাই যেতে দিলো না। শেষবারের মতো মুখখানা আর একবার খুলে দেখলো লুবান।

একি মা যে আজ আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছেন! হাসি হাসি মুখে ঘুমিয়ে আছেন।

ডুকরে কেঁদে উঠলো লুবান। বড় বুয়া কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। লাশ নিয়ে সবাই চলে গেল। বড় ভাবীও যেন আজ বড় একা বোধ করলেন। তার শ্বশুর বাবা সবাই চলে গেছেন। আজ শাশুড়িও চলে গেছেন। এবার বুঝি তাদের পালা।

পীর সাহেবকে স্মরণ করে ভাবলেন, সবাই যাবে চলে। শান্ত করতে চেষ্টা করলেন নিজেকে। লুবানকে কাছে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

বড় ভাবী বিদেশ থেকে আসার পরই আলাদা বাসায় থাকেন। মা বলেছিলেন, লুবান যেন তার বড় ভাবীর কাছেই থাকে।

লুবান চলে এলো বড় ভাবীর কাছে। ভবঘুরের মতো ছন্নছাড়া ভাবে ঘুরে বেড়ায় লুবান। কখনও পাপড়িকে নিয়ে নির্জন মাঠে গিয়ে বসে। কখনও বোন লায়লার কাছে গিয়ে মার কথা বলতে বলতে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয়। কোথাও যেন স্থির থাকতে পারে না। বড় একা, বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। কোথায় গেলে সে শান্তি পাবে। সবাই বলে মা কি সবার চিরদিন থাকে?

কিন্তু কেমন করে বোঝাবে মা ছাড়া যে তার বড় একা মনে হয়। এতবড় হয়েও মার কাছে রাত্রে সে ঘুমাতো। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। ঘুম ভেঙ্গেই মার মুখখানা প্রতিদিন সকালে দেখতো। চোখ জুড়িয়ে যেতো তার। কিছুতেই ভুলতে পারে না ... কেমন করে বাঁচবে লুবান! এম.এ পাশ করে বাংলার রিসার্চ করছে লুবান, কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারে না। বোনেরা কত বুঝায় লুবানকে।

বড় ভাবী যেন আগলে রাখেন সর্বদা তাকে। লুবান এমনিতে কম কথা বলে, এখন যেন আরও চুপ হয়ে গেছে।

মা যেমন করে অনুক্ষণ তার সকল ব্যবস্থা করে দিতেন, বড় ভাবীও তেমনি সকল দিক খেয়াল করেন কিন্তু লুবানের ধারণা এরা সবাই তাকে অনুগ্রহ করে।

বড় ভাবী কোন কথার প্রতিবাদ করেন না।



বড় বউয়ের বিয়ের সময় লুবান মাত্র তিন বছরের ছিল। তখন থেকেই লুবানকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে তফাৎ করে দেখেননি কোনদিন। ভাবেন, কিছুদিন থাক, এতো সহজেই মাকে ভুলতে পারবে কেমন করে?

## ৪.

ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলছে। টেবিলে মাথা রেখে চুপ করে বসেছিল লুবান। পাপড়ি এসে পাশে যে দাঁড়িয়েছে, লুবান টেরও পায়নি। পাপড়িও নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বলতে পারছে না। মন চাচ্ছে কোঁকড়া চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে তন্ময়তা ভঙ্গ করে কথা বলে 'এমনি করে নিজেকে কেন শেষ করছো লুবান'। অকস্মাৎ চুড়ির টুংটাং শব্দে সচকিত হয়ে মাথা তুলে তাকালো লুবান। কি সুন্দর লাগছে পাপড়িকে! পরণে কচি কলাপাতা রঙের লাল পাড় শাড়ি। তার সঙ্গে ম্যাচ করে পরেছে লাল ব্লাউজটা। ছোট কপালে বড় করে দিয়েছে লাল টিপ।

শান্তকণ্ঠে পাপড়ি বললো, 'লুবান ভাই, এমনি করে নিজেকে শেষ করে কী লাভ? আপনি তো বলেন, একদিন তো সবাইকে যেতে হবে, যাতে ভালভাবে পৃথিবীর কাজ শেষ করে খোদার কাছে যেতে পারি তাই কি ভাল নয়?

অবাক দৃষ্টি মেলে তাকাল লুবান।

পাপড়ি এসব কথা কবে বলতে শিখলো। ওর পরিবারেও তো এ ধরনের কথা বলতে শেখার কথা নয়। তবে কি পাপড়ি এতদিনে তার কাছে এসেছে? হঠাৎ লুবান পাপড়ির হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় ভরে আকুল কণ্ঠে বললো, পাপড়ি তুমি কি বুঝতে পার আমার মনের অবস্থা। একে তো মা নেই। তাতে এতো অল্প বয়সে ধর্মের নানা কাজ। আমি যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীতে কত সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। কত আনন্দ চারদিকে। কিন্তু পীর সাহেব আমাকে এতো কাজ দিয়েছেন যে, সেগুলো শেষ করে পড়াশুনা করে তোমার কাছেও যেতে পারি না। কিন্তু আজ মনে হয়, এতো অল্প বয়সে এ পথে এগিয়ে যাওয়া যেন ঠিক হয়নি। যখন বন্ধুবান্ধবরা আমোদ প্রমোদ নিয়ে মশগুল, তখন হয়তো আমি একা একা বসে কী যেন ভাবছি। কী যে আমি চাই তা যেন আমি নিজেই জানি না। তবে বড় একা বোধ করি। মনে হয় মার মতো আমাকে আবার কেউ স্নেহ মমতা দিয়ে যদি আগলে রাখতো, তবে বুঝি আবার আমি প্রাণ খুলে হাসতে পারতাম।

দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে লুবানের হাতে, একি তুমি কাঁদছ! পাপড়ি পাপড়ি! পারবে তুমি আমাকে বাঁধতে?

কম্পিত কণ্ঠে পাপড়ি বলে, 'তাই দাও লুবান ভাই, তোমার সকল ভার আমার হাতে তুলে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমিও আর তোমার কষ্ট সইতে পারছি না।' হাতে ছোট্ট একটি চাপ দিয়ে লুবান বললো, 'তাই হবে পাপড়ি, আজ তুমি আমাকে অনেক শান্তি দিলে, জীবনে তোমাকে সাথী করে পেলে আমার আর ভয় নেই। আমার রিসার্চ শেষ হলে বড় ভাবীকে জানাবো। বড় ভাবী তোমাকে খুব স্নেহ করেন, তাঁর অমত হবে না।'

পাপড়ির মন শান্ত হলো। নরম কণ্ঠে বললো, 'তুমি তো পীর সাহেব মানুষ, আমার একটি অনুরোধ রাখবে?'

আয়ত চোখ তুলে লুবান বললো, কোনদিন তোমার কথা ফেলেছি? বলো কি হুকুম? কলকলিয়ে হেসে উঠে পাপড়ি বললো, 'অনেক দিনের ইচ্ছে দু'জনে সিনেমায় যাই'। কিন্তু বাবা! যে মানুষ তুমি, কোনদিন ভয়ে বলিনি। যাবে লুবান ভাই। আল্লাহ তো মানুষকে এমনিভাবে তিলে তিলে মরতে বলেনি, দুনিয়ার পাপ তোমাকে স্পর্শ না করলেই হলো।

একটু আনন্দ পাওয়া এ যে পরম পাওয়া। জীবন ক্ষণস্থায়ী। বর্তমান ব্যস্ততার যুগে কতটুকু আনন্দ আসে আমাদের জীবনে।

'চল'। উঠে দাঁড়িয়ে লুবান পাপড়িকে বললো, আজ থেকে আমার সম্পূর্ণ ভার তোমাকে দিলাম।

হাসি ছড়িয়ে পড়লো পাপড়ির কণ্ঠে।

বড় ভাই বদলী হয়ে গেল। বিদায়ের দিন বড় ভাবীর বিছানায় বসে লুবান অনেকক্ষণ কাঁদলো। আবার একা হলো লুবান। স্নেহ মমতায় ঘিরেছিলেন বড় ভাবী, মার অভাব অনেকটা ভুলে এসেছিল। বোনদের মধ্যে লায়লার সঙ্গে তার মনের মিল বেশি। প্রতিদিন একবার করে যায় লুবান তার বাসায়।

বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি নেমেছে। শরৎকাল। আশ্বিনের মাঝামাঝি। তবুও এবার যেন বৃষ্টির বিরাম নেই।

একা বসে বসে লুবানের মন উন্মনা হয়ে উঠেছিল। কয়দিন থেকে পাপড়ির দেখা নেই।

পাপড়িই সবসময় আসে। কখনও সে যায় তাদের বাড়ি। আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা নিয়ে গায়ে দিলো লুবান। মন্থরগতিতে বেরিয়ে গেল।

পাপড়িদের বাসার সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো লুবান। ড্রয়িং রুমে বহু লোক বসে আলোচনায় ব্যস্ত।



চাকরকে ইশারাতে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় চাকর রহিম একগাল হেসে বললো, লুবান ভাই, আজ আপাকে যে দেখতে এসেছে, তাই এতো লোক। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলো লুবান, এটাই তো স্বাভাবিক। বড়লোকের মেয়ে পাপড়ি। তাকে বড়লোকের ঘরে দেবেন তার বাপ-মা। কিন্তু পাপড়ি কি একবার তাকে জানাতে পারতো না! তবে কি সবই মিথ্যা? পাপড়ির ভালবাসাও ছলনা। দু'দিনের খেলা। একি করেছে লুবান। এমন করে নিজেকে নিঃস্ব করে সঁপে দিয়েছে পাপড়ির হাতে। পাপড়ি যে তাকে কথা দিয়েছিল। তার সকল ভার গ্রহণ করবে। একবার কি পাপড়ির সঙ্গে দেখা হয় না? না, তা আজ আর সম্ভবপর নয়।

ছোট্ট একটুকরা কাগজ রহিমকে দিয়ে বললো, 'গোপনে যেন পাপড়িকে দেয়।' হন হন করে এগিয়ে চললো লুবান। ...

লুবান পীর বাড়ির ছেলে।

এ বাড়িতে কেউ কোনদিন ধূমপান পর্যন্ত করেনি। সিনেমা দেখেনি। দুনিয়ার অনেক আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে সংযম জীবনযাপন করাই এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

আর লুবান অনবরত ধূমপান করে চলেছে। নগ্ন ছবি আসলেই দেখতে ছুটে যায়। পাগল হয়ে যাবে বুঝি। বোন লায়লা কেঁদে আকুল হয়ে লুবানকে ফেরাতে চায়। কিন্তু পারে না।

লুবান বলে পাপড়ি সেও পর হয়ে গেল। কী নিয়ে বাঁচবে লুবান। আল্লাহকে পাবার জন্য অল্প বয়সে সকল আমোদ প্রমোদ বিসর্জন দিয়ে এবাদতের দিকে মন দিয়েছিল, কিন্তু আধুনিক দুনিয়ার জৌলুসে তাকে সে পথেও যেতে দেয়নি।

পাপড়ি তার জীবনের পরম শত্রু। সে তাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে এনে আমোদ প্রমোদে এতদিন ডুবিয়ে রেখেছিল। এখন তার পথ কোথায়? আল্লাহকে কী মুখ দেখাবে লুবান? লায়লা বলে, 'তুমি একবার পাপড়িকে ডেকে পাঠাও। নিশ্চয় সে বাধ্য হয়ে চুপ করে আছে। তোমার দিক থেকে সাড়া পেলেই সে নিশ্চয় এগিয়ে আসবে!'

লুবান বিকৃত স্বরে বলে, 'না না, আর মিথ্যা লোভ আমায় দেখিও না। বড়লোকদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

লায়লা কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'লুবান, বিপদে ধৈর্য্যহারা হওয়া পুরুষের কাজ নয়। ঠিক আছে, আমি বড় ভাবীকে সব খুলে লিখবো। তিনি নিশ্চয় ব্যবস্থা করতে পারবেন। পাপড়ির মা বড় ভাবীকে স্নেহ করেন।

লুবান রাগত কণ্ঠে বলে, না আপা, আমরা গরিব। আমাদের কোন প্রস্তাব দেওয়াই ভাল না।

লায়লা এক প্লেট নাস্তা এনে বললো, 'আচ্ছা খাও, ক'দিন থেকে খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, কী চেহারা করেছ?'

লুবান খেতে শুরু করে দিলো। ক'দিন পেট ভরে খায়নি। মন তার বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। একি নিয়তির খেলা!

লুবান ঘরে বাতি নিভিয়ে শুয়েছিল। দরদ ভরা গলায় পাপড়ি ডাকলো, 'লুবান ভাই, ঘুমিয়ে আছো। বাতি জ্বালাও।'

কণ্ঠ শুনেই লুবান পাপড়িকে চিনে ফেলেছে, তুমি পাপড়ি! তুমি এতদিন পরে কেন এসেছ? ওঃ শুভ সংবাদ দিতে?

বাতি জ্বালিয়ে কান্নাভরা কণ্ঠে পাপড়ি বললো, 'আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিও না। তুমিও ভুল বুঝলে। অভিযোগ আমারই করা সাজে। নিজের জিনিস আরেকজন নিয়ে যাচ্ছে শুনে দূরে সরে আছো? এতে লজ্জা করে না মুখ দেখাতে? প্রতিদিন ভাবি, তুমি নিশ্চয় এসব কথা শুনে অন্তত ভাইয়াকে বলবে। ভাইয়া তোমার বন্ধু।

যাক বলার কিছু নেই। তোমার দিক থেকে যদি আগ্রহ না থাকে তবে আমি যেখানেই যাই না কেন কোন অভিযোগ আমার নেই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলি শুনছিলো লুবান। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পাপড়িকে কাছে টেনে নিয়ে কী যেন বলতে চাইলো লুবান। কিন্তু চমকে আবার সরে দাঁড়ালো।

বড় ভাবী যে কখন এসে ঘরে প্রবেশ করেছেন তা দু'জনে টের পায়নি। মৃদুকণ্ঠে ভাবী বললেন, 'বাঃ নিজেরাই সকল সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছো। তবে অতদূর থেকে আমাকে কেন টেনে আনা বাবা।'

পাপড়ি উঠে দাঁড়ালো। বড় ভাবী কাছে টেনে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, 'আজ থেকে চিন্তা গেল। ছন্নছাড়া ছেলেটাকে আদর দিয়ে ধমক দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বেঁধে রেখো। তোমার আম্মার কাছে কাল গিয়েছিলাম। তিনি লুবানকে পেয়ে দু'হাত তুলে মোনাজাত করলেন। দ্বিধায় এতোদিন নাকি তোমার মা-বাবা আমাকে বলতে পারেন নি।

লুবান ও পাপড়ি ভাবীর পদধূলি নিলো।

দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন বড় ভাবী।

কমর মুশতারী, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম
অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সম্পাদিত *নিসর্গ*, বৈশাখ ১৩৭৭





# শেষ কথা : আপন যে জন

## আবদুল মান্নান

উনিশশো তিরাশির সতেরই জানুয়ারি সোমবার পড়ন্ত বিকেলে মেহরাব আমাদের এলিফ্যান্ট রোডের বাসায়। এমন সময় ফোন পেলাম – খালা-আম্মা মেহরাবের মামণি আর নেই। আমি আর শিউলি মেহরাবকে সঙ্গে করে পৌঁছলাম স্যারের (প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান) কলাবাগান বশিরউদ্দিন রোডের বাসায়। খালা-আম্মার নিথর দেহ খাটের উপর সাদা চাদরে আবৃত। স্যার নির্বাক, অনন্ত জিজ্ঞাসায় সবাইকে দেখছেন। মৃত্যুসংবাদ অনেকে জেনে গেছেন। আসতে শুরু করেছেন স্যারের প্রতিষ্ঠিত ছাত্র, কবি-সাহিত্যিক, সরকারি কর্মকর্তা, আত্মীয়স্বজন। ড. মল্লিক খালা-আম্মার আত্মীয়। তিনি এলেন সস্ত্রীক। পরদিন অর্থাৎ আঠারো জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে বনানীর সংরক্ষিত কবরে দাফন সম্পন্ন হলো।

খালা-আম্মা কমর মুশতারী পুলিশ অফিসারের মেয়ে সৈয়দ পরিবারের বড়বৌ হয়ে এলেন। স্বামী খ্যাতিমান কবি, গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কীর্তিমান শিক্ষক। তাঁর ছোটভাই ড. আলী আশরাফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তুখোড় ছাত্র। হার্ভার্ড কেমব্রিজের প্রফেসর। আরো উপযুক্ত তিন ভাই কয়েকজন বোনের পরিবার। ছোট পরিবার থেকে একেবারে বড় পরিবারে। অভিজাত বিত্তশালী পরিবার থেকে ঐতিহ্যবাহী পীর পরিবারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন যথারীতি। স্বামী কবি, স্বামী শিক্ষক, স্বামীর উপার্জন ছাড়া সংসারের সব দায়িত্ব বহন করতেন খালা-আম্মা। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। যেমন ছিলেন রক্ষণশীল, তেমনি ছিলেন আধুনিক। আচার-বিচারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আহারে তাঁর তুল্য কোন মহিলার সঙ্গে এখনো আমার পরিচয় হয় নি। আমি উনিশশো সাতষট্টি সালে চট্টগ্রামে তাঁর মমতার ছায়ায় আশ্রয় লাভ করি। শিউলির সঙ্গে বিয়ের পর উনিশশো উনসত্তর সাল থেকে স্যারের পরিবারের সকল সদস্যের মান্নান ভাই, খালেদা আপা হয়ে গেলাম আমরা।

খালা-আম্মা শুধু বিদুষীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুগৃহিণী এবং রন্ধনশিল্পী। তাঁর রাঁধা কাঁঠালের এঁচোড় কলার মোচার ডালনা কলার থোড় রান্না যাঁরা খেয়েছেন অথবা পায়েশ ফিরনি কাবাব যাঁরা খেয়েছেন, তাঁরা

কোনদিন ভুলতে পারবেন না এমন স্বাদ আর সৌষ্ঠবের কথা। উনিশশো সাতষট্টি সালের শেষ দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক চট্টগ্রাম এসেছিলেন। স্যার তাঁদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করেন। মিসেস আহসান চট্টগ্রামের বিভিন্ন ধরনের শুটকির ভিন্ন ভিন্ন প্রিপারেশন করেন। রাজ্জাক স্যার সবকিছু বাদ দিয়ে শুটকির প্রিপারেশন খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন। রান্নায় কমর মুশতারীর মুন্সিয়ানার প্রশংসা করেছিলেন রাজ্জাক স্যার। রাজ্জাক স্যারকে পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর করতে না পারলেও স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাচ্যের প্রবাদতুল্য অধ্যাপক লাসকির এই অকৃতদার প্রিয় ছাত্রকে জাতীয় অধ্যাপক পদে ভূষিত করেন। সে ভোজে আরো অংশগ্রহণ করেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-উপাচার্য, সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং অর্থমন্ত্রী ড. এ.আর. মল্লিক, ইতিহাস বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান ড. আবদুল করিম, অর্থনীতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান ড. আতহার এবং ইংরেজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান মোহাম্মদ আলী। স্যারের মাসিক আয়ে খালা-আম্মা একটি বাজেট করতেন প্রতি মাসের। প্রতিটি খাত আলাদা আলাদা খামে রেখে খাতের নাম খামে লিখে রাখতেন। খালেদা আখতার বানু অর্থাৎ শিউলি সংসার শুরু করতেই খালা-আম্মার কাছে বাজেট তৈরি এবং বিভাজন শিখে নিয়ে সারা জীবন খামের উপর খাতের নাম লিখে সংসার চালাতেন। আমাদের মেয়ে লপিতা তার মায়ের কাছে শেখা সেই ভাবে খামে লিখে মাসিক ব্যয় নির্বাহ করে।

খালা-আম্মা দানশীলা, কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে কোন মিসকিন কিছু না পেয়ে ফিরে গেছে এমন নজির নেই। আতিথেয়তায় ছিলেন অনন্যা। স্যারের আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, কবি-সাহিত্যিক, এমনকি ছাত্র-ছাত্রীরাও তাঁর আপ্যায়ন থেকে কখনো বঞ্চিত হয়নি।

স্যারের সাপ্তাহিক ছুটিতে বাইরে যাওয়ার, বিশেষ করে চট্টগ্রামের পাহাড় সমুদ্র বনে যাওয়ার সঙ্গী ছিলাম আমি আর শিউলি। মেহরাব সে সময় আনকোরা নতুন টয়োটা গাড়ি চালাতো। স্যার মেহরাবের পাশে বসতেন। আমি, শিউলি, খালা-আম্মা, নাসরিন গাড়ির পেছনের সীটে বসতাম। কখনো কখনো সিমাবও থাকতো। খালা-আম্মা বাসা থেকে নানান



স্বাদের খাবার তৈরি করে নিয়ে যেতেন। সবাই আমরা সেইসব খাবার খেতাম।

পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও স্যার আধুনিক এবং উদার ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্র হয়েও সৈয়দ আলী আহসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বাংলা বিভাগে সেই সময় তাঁর মতো আরো একজন যশস্বী শিক্ষক ছিলেন মুনীর চৌধুরী। মুনীর চৌধুরী স্যারের মতো ইংরেজি বিভাগের ছাত্র, বাংলার প্রফেসর ছিলেন। অবশ্য মুনীর চৌধুরী জেলে থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ পাশ করেছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসানের শব্দচয়ন, নতুন শব্দ যৌক্তিকভাবে নির্মাণের তুল্য একমাত্র মুনীর চৌধুরী। মুনীর চৌধুরী খালা-আম্মাকে ভাবী ডাকতেন এবং তাঁকে গৃহলক্ষ্মী বলতেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ঋণী। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমাদের প্রথম সন্তান তমাল জন্মগ্রহণ করে তেইশ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে। প্রথম সন্তানের জন্মলগ্নে শিউলির পাশে হাসপাতালে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন মিসেস মল্লিক (ড. এ.আর. মল্লিকের স্ত্রী রহমত আরা মল্লিক) এবং মিসেস আহসান (প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের স্ত্রী কমর মুশতারী আহসান)। তাঁদের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। হাসপাতাল থেকে নবজাতক ও শিউলিকে চট্টগ্রামের জাকির হোসেন রোডের বাসায় নিজে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দেয় মেহরাব – এটা ছিল খালা-আম্মার অভিপ্রায়। সন্তান প্রসবের পর যেসব বিশেষ খাবার দরকার তা তৈরি করে শিউলির জন্য পাঠাতেন এই মহীয়সী মহিলা। কমর মুশতারী খালা-আম্মা আরো দুটি বিষয়ে বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আর 'দালাল খ্যাত' কোন সময় কাজা করতেন না। তিনি বিকেলে গোসল করে পাটভাঙ্গা শাড়ি ব্লাউজ পরে জমিদার গৃহিণীর মেজাজে থাকতেন। ইস্ত্রি করা একটি শাড়ি একবারের বেশি ব্যবহার করতেন না। খুব ধোপদুরস্ত ছিলেন তিনি। এটা তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল।

## উপসংহার

প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের দেশজোড়া খ্যাতি আর ভক্ত। কখনো কখনো দেশের বাইরেও তিনি সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর আধুনিক কবিতা বিষয়ে পাঠদান রবীন্দ্রনাথকে নতুন বোধে এবং বিবেচনায় আবিষ্কার করায়

ছাত্র-ছাত্রী সহ ঋদ্ধ শ্রোতা মুগ্ধ থাকতো। এমন মানুষের স্ত্রী হওয়া যেমন গৌরবের তেমনি কিছু বিড়ম্বনাও ছিল। খালা-আম্মা স্যারের সর্বগ্রাসী প্রতিভার কাছে বিলীন হতে চাইতেন না। তিনি মিসেস আহসান। তারপরেও তাঁর নিজস্ব একটি ভুবন আছে, যেখানে তিনি তাঁর গ্রন্থে কমর মুশতারী নামেই অভিহিত। সেখানে আহসান যোগ করেননি। উনিশশো চৌষট্টি সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পূর্বাপর' প্রকাশিত হয়। আটটি গল্প। চাকুরীজীবী পিতার বদলী চাকুরীর অভিজ্ঞতায় সামাজিক দ্রোহ এবং প্রেম নিয়ে গল্পগুলো আবর্তিত। সম্ভবত উনিশশো আটষট্টি সালে চট্টগ্রামে স্বল্প পরিসরে 'পূর্বাপর' গ্রন্থের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় চট্টগ্রামের বিশিষ্টজনের সঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানও উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অশান্ত মন শান্ত হল'। এই গ্রন্থেরও একটি প্রকাশনা উৎসব হয়েছিল। এই উৎসবে স্যারের নামী বন্ধু ও ছাত্রদের সঙ্গে সর্বজন শ্রদ্ধেয়া কবি বেগম সুফিয়া কামাল উপস্থিত ছিলেন। খ্যাতিমান স্বামীর যশের পাশাপাশি তিনিও যশস্বী হতে চেয়েছেন। তাঁর স্বকীয়তা বজায় রাখার অবিরাম প্রচেষ্টা। সৈয়দ আলী আহসানের পরিবারে সাহিত্য চর্চার একটি আবহ ছিল। তিনিও সেই আবহে একজন যাত্রী ছিলেন। স্যার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ বিদেশী পণ্ডিত এবং দেশী প্রাজ্ঞজনকে উৎসর্গ করেছেন। ছেলেমেয়েদেরও উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু খালা-আম্মার মৃত্যুর আগে তাঁকে কোন বই উৎসর্গ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর মৃত্যুর পরপরই বাংলা ভাষায় চিত্রকলার বিষয়ে তাঁর অবিনাশী গ্রন্থ 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য' গ্রন্থটি উৎসর্গ করে লেখেন – 'আমার স্ত্রী কমর মুশতারীকে যিনি আর নেই'। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় চিত্রকলার বিসয়ে অসাধারণ একটি সংযোজন। তিনি যখন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে চারুকলা বিষয়ে আর্ট এপ্রিসিয়েশন কোর্স করাতেন, তখন যেসব বক্তৃতা করেছেন তারই সংকলন এই গ্রন্থটি।

আরো একটি ছোট পরিসরের বই, এটি তাঁর মৌলিক কোন রচনা নয়– অনুবাদ। হিন্দি কবি আবদুর রহমান-এর 'সন্দেশ-রাসক' হিন্দি সাহিত্যে শৃংগার রসাশ্রিত অনুবাদ পুস্তিকাটিও উৎসর্গ করেন 'কমর মুশতারী'। স্যারের শেষ জীবনের অনুবাদ। যেটা 'পদ্মাবতী'র মতো বিশাল কোন গবেষণা গ্রন্থ নয়। তবু আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন হিন্দি সাহিত্য পরিচয়ের ক্ষেত্রে অনন্য প্রচেষ্টা। বইটি উনিশশো নিরানব্বই সালে প্রকাশিত হয় – খালা-আম্মার মৃত্যুর নয় বৎসর পরে।



# বড় চাচীর স্মৃতি

## সৈয়দা তাসনিমা রেজা

বড় চাচী আব্বাদের বংশের বড় বউ। উনার সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে। কিছুদিন আগে নাচ্ছু আপা এসে বললেন, আম্মার কাছ থেকে বড় চাচী সম্বন্ধে যা শোনা যায় সেটা লিখে তাঁকে দিতে। কিন্তু আম্মার বয়স হওয়াতে এখন অনেক কিছুই মনে থাকে না। তাই বড় ভাইয়া (জামিল) বড় চাচী সম্বন্ধে যা জানেন এবং আম্মার মুখে বড় চাচী সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি তা লেখার চেষ্টা করছি।

আম্মার ভাষায় বড় চাচী ছিলেন খুব সৌখিন মানুষ এবং খুব টিপটপ। আম্মা বলতেন, এই পরিবারের উপর চাচীর নাকি খুব প্রভাব ছিল। সবাই বড় চাচীকে অনেক ভয় পেতেন এবং শ্রদ্ধাও করতেন। বড় চাচীকে আমিও দেখেছি। তিনি খুব সুন্দর এবং হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। যদিও আমি অনেক ছোট ছিলাম, তাই উনার কথা খুব একটা মনে নেই। এতটুকু মনে আছে, উনাকে দেখেছি বাসার পরার কাপড়ও ইস্ত্রি করে পরতেন। সকালে ও বিকালে তিনি কাপড় বদলাতেন। খুব ফিটফাট থাকতেন। আম্মার মুখে শুনেছি, চাচী আম্মাকে খুব আদর করতেন এবং বাসায় আসলেই বলতেন টিপটপ থাকতে। আরও বলতেন, 'তোমার যা আছে তাতেই ভাল থাকার চেষ্টা কর।' বড় ভাইয়ার (জামিল) কাছে শুনেছি, প্রতি ঈদে তিনি সবাইকে কাপড় দিতেন এবং ঈদের সালামি দিতেন। ঈদের দিন বড় ভাইয়ারা আগা সাদেক রোডে বড় চাচীদের বাসায় যেতেন এবং সবাই মিলে নামাজ পড়তেন। নামাজ পড়ে এসে দুপুরের খাওয়া ওখানেই সবাই খেতেন। বড় চাচী নিজেই সবাইকে খাওয়া পরিবেশন করতেন।

বড় চাচা যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ক্লে বাংলাদেশে এসেছিলেন। বড় চাচা উনাকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করেছিলেন। আমরা সবাই উনাকে দেখতে বড় চাচার বাসায় গিয়েছিলাম। বড় চাচা, চাচী, মোহাম্মদ আলী ক্লে-এর সঙ্গে আমরা সবাই অনেক ছবি তুলেছিলাম। সে ছবিটা আজও আমার কাছে আছে।

বড় চাচী অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রতিটা কাজ আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। বড় চাচীর গুণাবলী আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বড় চাচী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু উনার প্রয়োজনটা এখনও আমরা সবাই অনুভব করি। আল্লাহ উনাকে বেহেশত নসিব করুন।

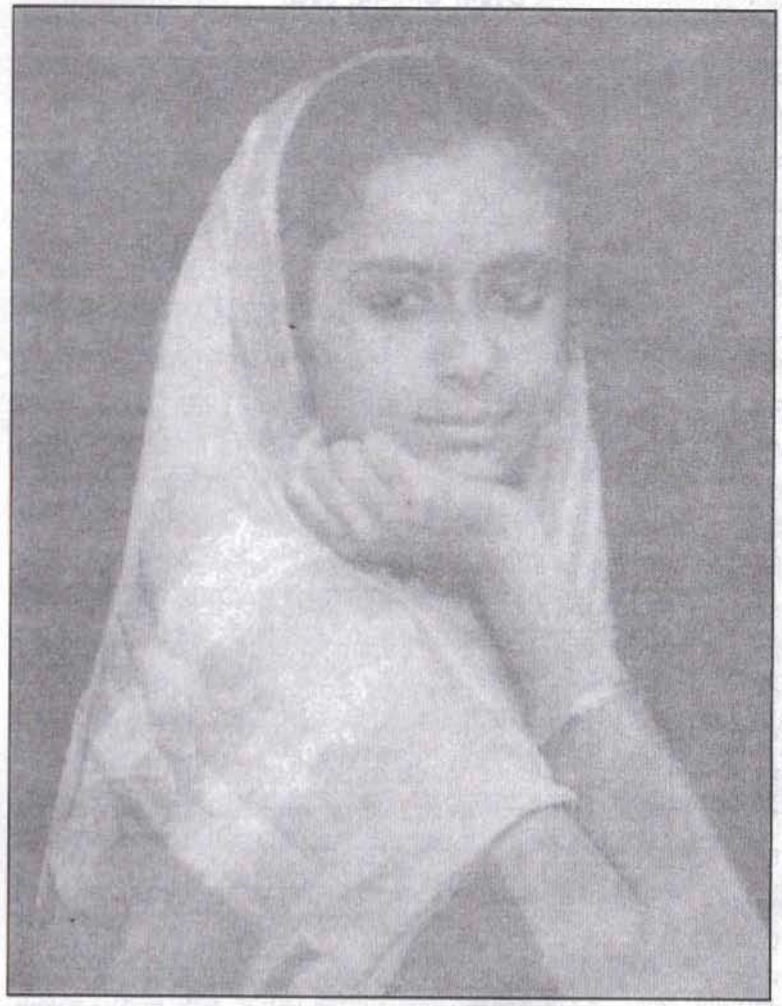

কলকাতায় কমর মুশতারী।



## মা-মণির ৪টি চিঠি

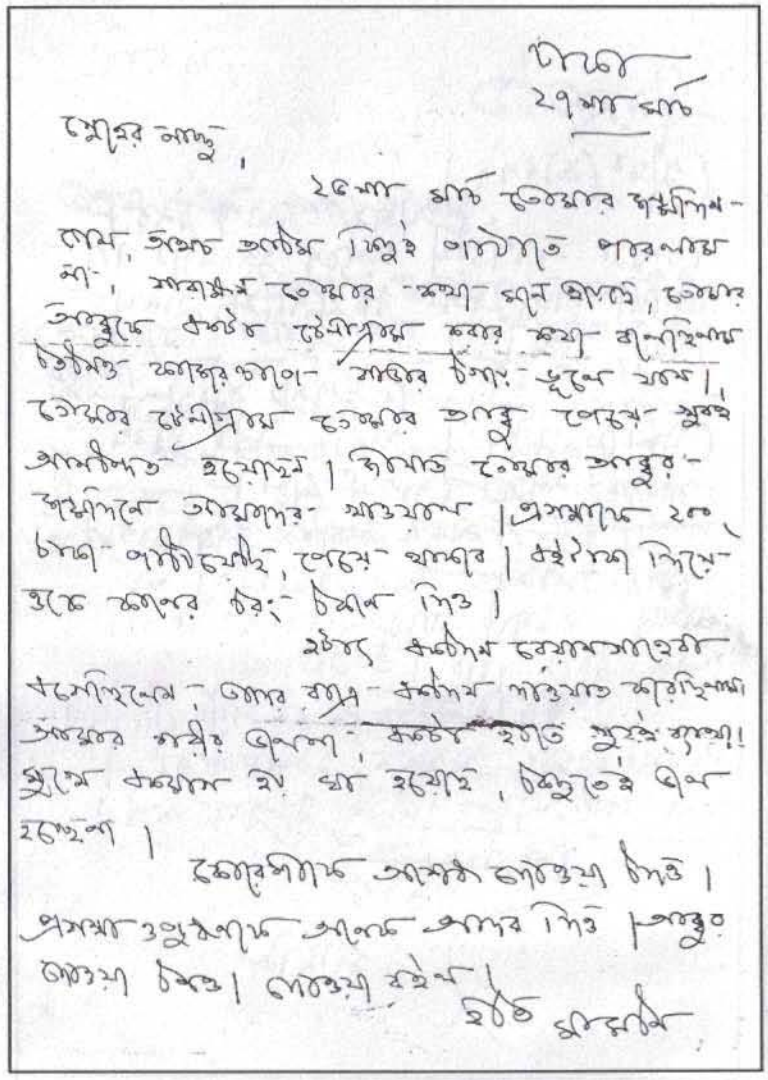

নাসরীনকে লেখা মা-মণির চিঠি [১৯৭৪]।

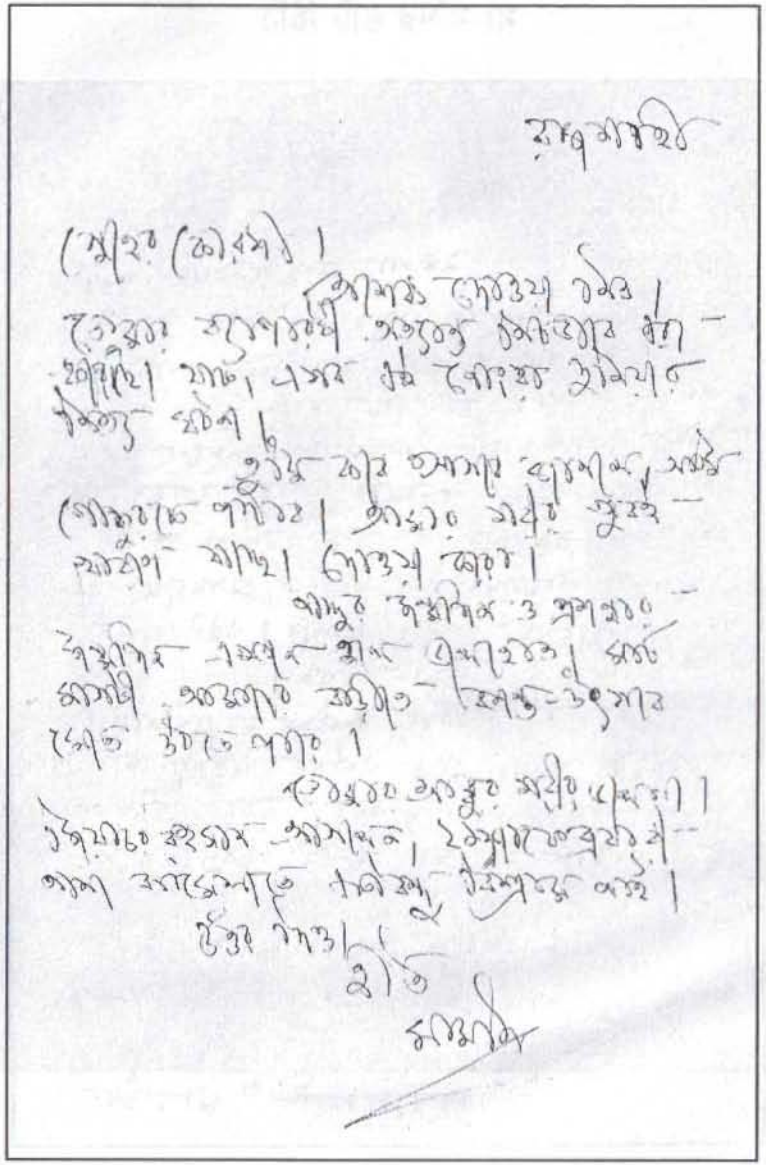

মাহমুদ শাহ কোরেশীকে লেখা মা-মণির চিঠি [১৯৭৭]।



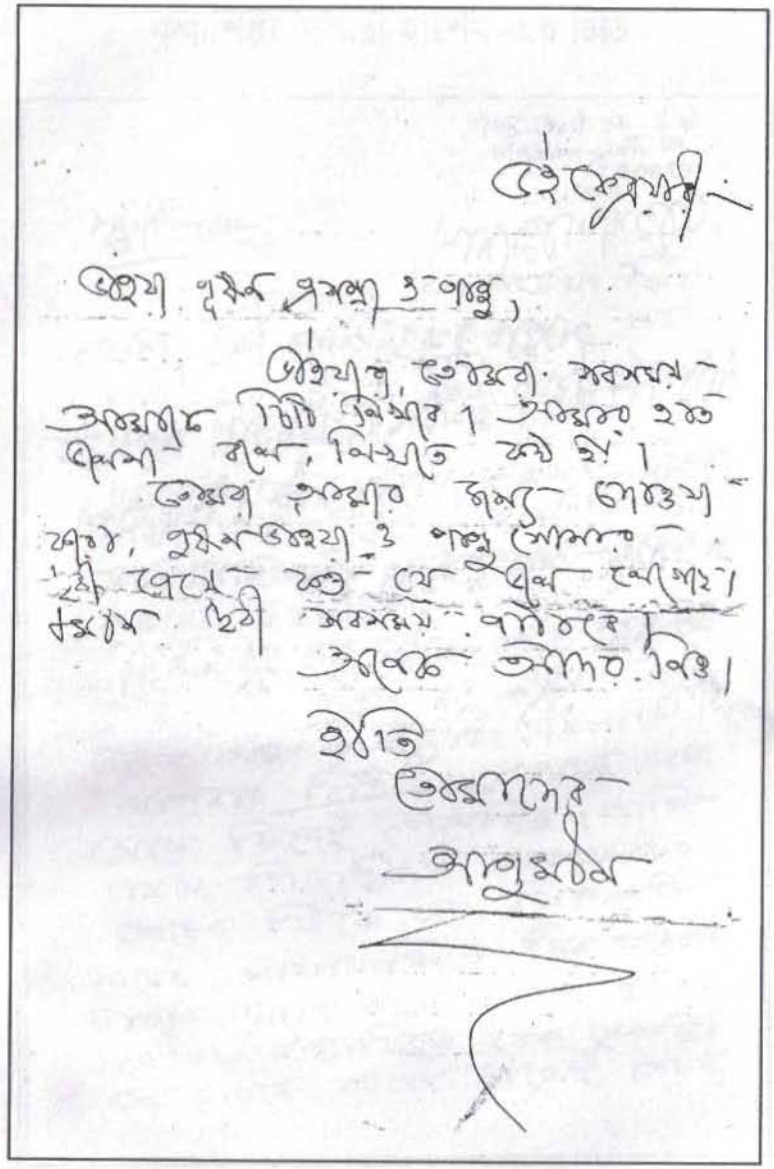

পূষণ, প্রসন্না ও পাপ্পুকে লেখা মা-মণির চিঠি।

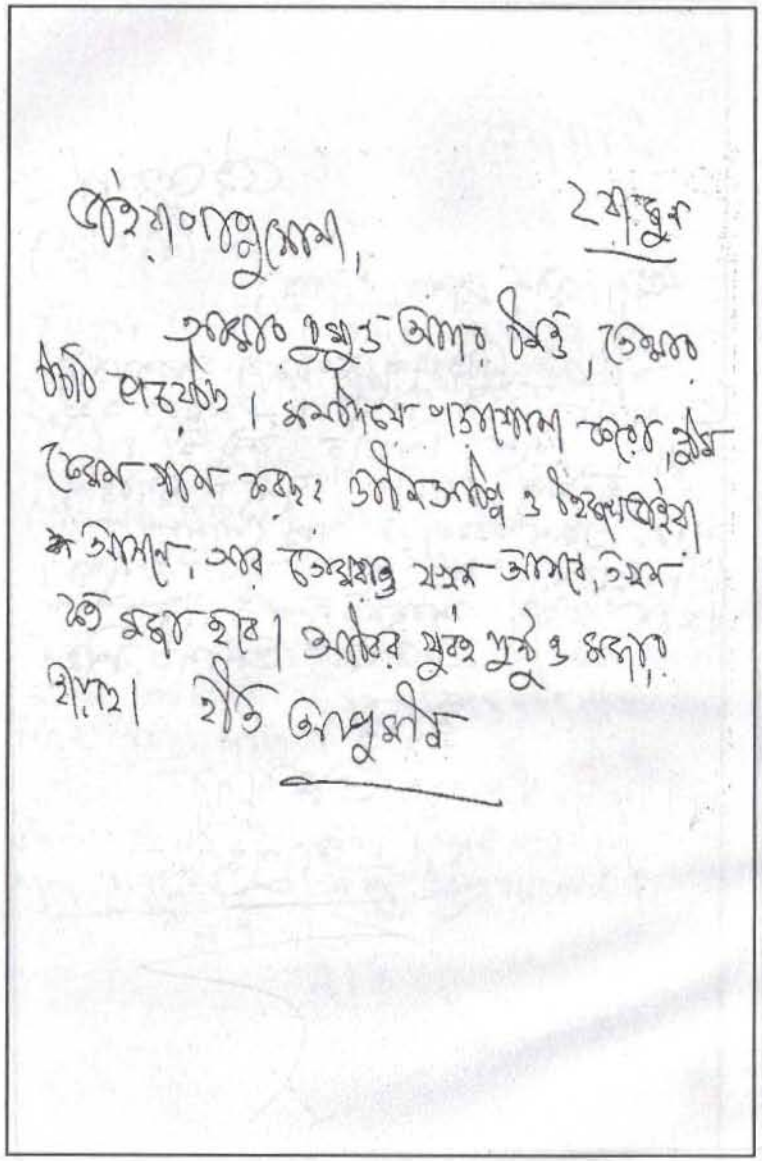

পাপ্পুকে লেখা মা-মণির চিঠি।



## কথাশিল্পী দিলারা হাশেম-এর চিঠি

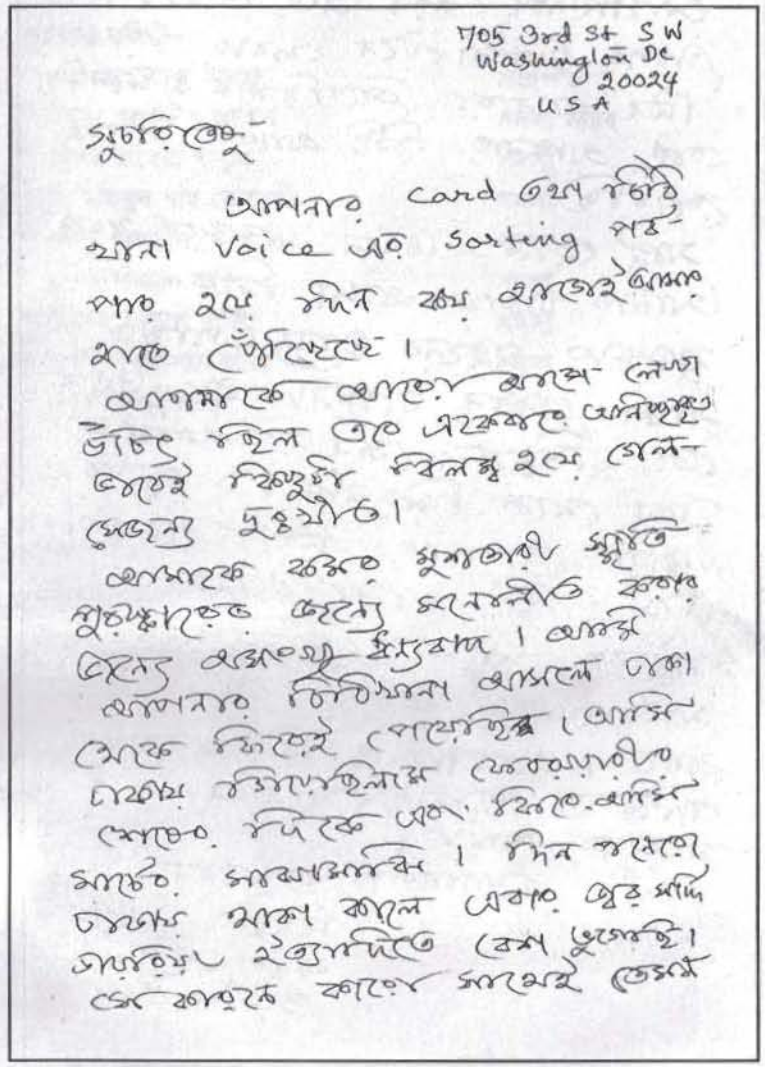

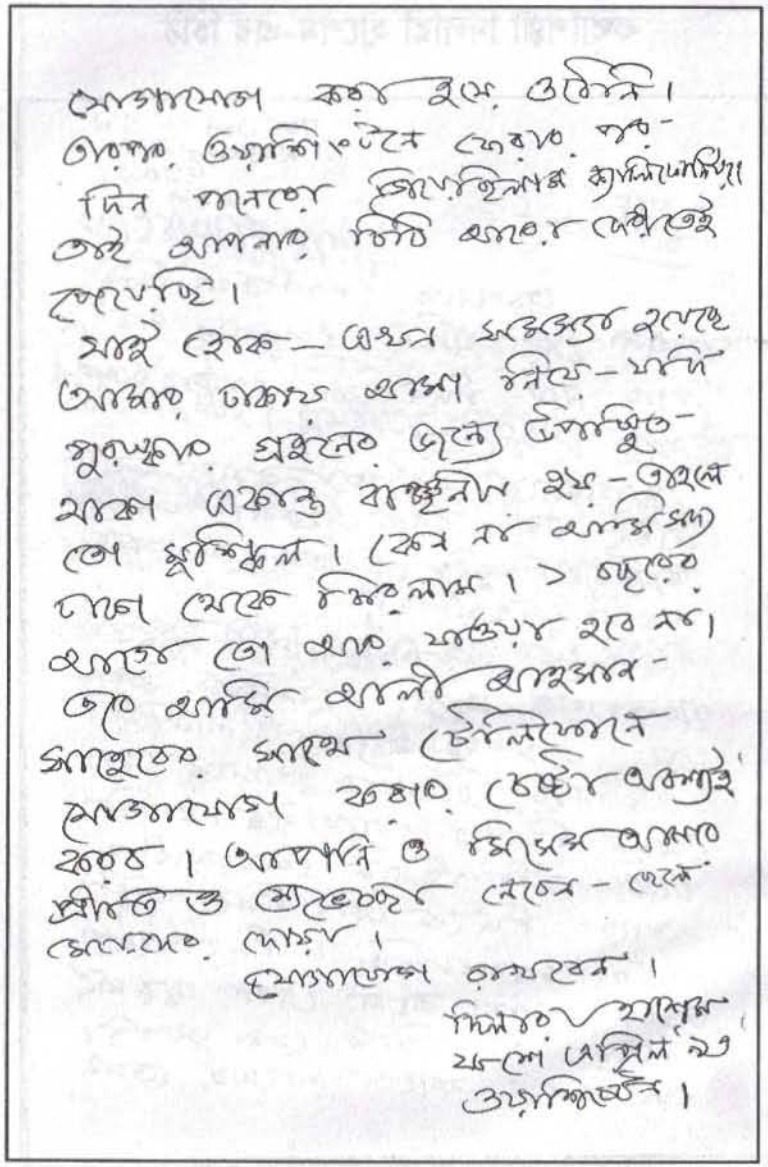



## কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার

পুরস্কার কমিটি

| | |
|---|---|
| * কবি জাহানারা আরজু | সভাপতি |
| * সৈয়দ আলীউল আমিন | সদস্য সচিব |
| * বেগম রাবেয়া খাতুন | সদস্য |
| * ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী | সদস্য |
| * বেগম নাসরীন কোরেশী | সদস্য |
| * জনাব ফজলে রাব্বি | সদস্য |
| * মিসেস ফজলে রাব্বি | সদস্য |
| * জুবাইদা গুলশান আরা | সদস্য |
| * রোকেয়া সুলতানা | সদস্য |

# ১৯৮৩ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব

ড. রাজিয়া খান আমিন
রিজিয়া রহমান
মকবুলা মনজুর
হেলেনা খান
মাফরূহা চৌধুরী
জাহানারা আরজু
জুবাইদা গুলশান আরা
ড. বেগম জাহান আরা
হোসনে আরা শাহেদ
নূরজাহান বেগম ('বেগম' সম্পাদিকা)
ড. খালেদা সালাউদ্দিন
ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ
রাবেয়া মঈন
ড. মালিহা খাতুন
ফাহমিদা আমিন
নয়ন রহমান
ফরিদা হোসেন
বেগম রাজিয়া হোসাইন
মীনা আজিজ
রাবেয়া খাতুন
শামস রশীদ
সেলিনা হোসেন
দিলারা হাশেম (প্রস্তাবিত)



বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

## কমর মুশতরী স্মৃতি-পুরস্কার ১৯৯৩

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী '৯৪, বুধবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ঢাকাস্থ ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে (ধানমন্ডী আবাসিক এলাকা, সড়ক নং ৮, গৃহ নং ৫৪) কমর মুশতরী স্মৃতি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় ১৯৯৩ সালের স্মৃতি পুরস্কার কবি জাহানারা আরজুকে প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক রাজিয়া খান আমিন।

আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

সৈয়দ আলী-উল-আমীন
আহ্বায়ক ঃ কমর মুশতরী স্মৃতি-কমিটি
টেলিফোন ঃ ৩১৬৬৮৯, ৩২৪৩০৯

বেগম জাহানারা
সভাপতি

কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান-১৯৯৩ এর নিমন্ত্রণপত্র।

### কমর মুশতরী স্মৃতি পুরস্কার ১৯৯৯ ও ২০০০

সুধী,
আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শুক্রবার বিকেল ৪টায় ইরানীয় কালচারাল সেন্টার, বাড়ী নং-৫৪, রোড নং ৮/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। মিলনায়তনে কমর মুশতরী স্মৃতি পুরস্কার ১৯৯৯ ও ২০০০ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে বিশিষ্ট লেখিকা হেলেনা খান, নয়ন রহমান, খালেদা সালাহউদ্দিন এবং ফরিদা হোসেনকে। কবি জাহানারা আরজু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। প্রধান অতিথি থাকবেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান।

সৈয়দ আলীউল আমীন (সিমাব)
সচিব
কমর মুশতরী স্মৃতি পুরস্কার কমিটি

টেলিফোন ঃ ৯১১৬৬৮৯

কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান-১৯৯৯ ও ২০০০ এর নিমন্ত্রণপত্র।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জনাব,

আমার স্ত্রী কমর মুশতরী আহসানের চেহলাম শুক্রবার ২৫ শে ফেব্রুয়ারী বাদ জুম'আ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে ৬০/১ বশীরউদ্দীন রোড, উত্তর ধানমন্ডীতে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে দোয়ায় অংশগ্রহণ করলে বাধিত হব।

আপনাদের
সৈয়দ আলী আহসান

কমর মুশতারী আহসানের চেহলামের নিমন্ত্রণপত্র। এই অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক ও ঢাকার শিল্পী-সাহিত্যিক বিশেষ করে কবি শামসুর রাহমান উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ক্লাব

সুধী,

আগামী ১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (২৫শে মে) বিকেল সাড়ে পাঁচটায় নজরুল জয়ন্তী এবং কমর মুস্তারী স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ক্লাব এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর এম. এ. রকীব। বিশেষ অতিথি প্রফেসর মযহারুল ইসলাম ও প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান। আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

রাশেদা খালেক
সম্পাদিকা

সময় ঃ- বিকেল সাড়ে পাঁচটা।
তারিখ ঃ- ১১ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার (২৫শে মে)
স্থান ঃ- মহিলা ক্লাব ভবন (রোকেয়া হলের উত্তরে ৫২/ক)

কমর মুশতারী স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন-এর নিমন্ত্রণপত্র।

পাইপ মুখে মিটি ভাইয়া : মা-মণির বাবা।

মা-মণির একমাত্র ভাই বাবলু।

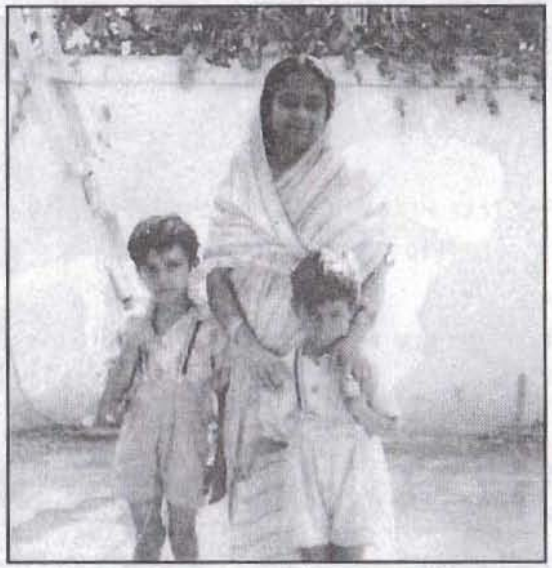

করাচীতে শিশুপুত্র মেহরাব ও সিমাব সহ মা-মণি।

করাচীতে জিনাত (২য়) নাসরীন (৪র্থ) ও সহপাঠীদের সঙ্গে মা-মণি (৫ম)
ও মিসেস ফারুখ (রানী-১০ম)।

করাচীতে নাসরীন ও জিনাত সহ মা-মণি।

ঢাকার আগামসিহ্ লেনের বাসায় মা-মণি, সিমাব, বড় ফুপু (সুলতানা), আব্বু।
নাসরীন ও বড় ফুপুর মেয়ে নাজমা।

একই আঙ্গিনায় মা-মণির পেছনে জিনাত ও নাসরীন।

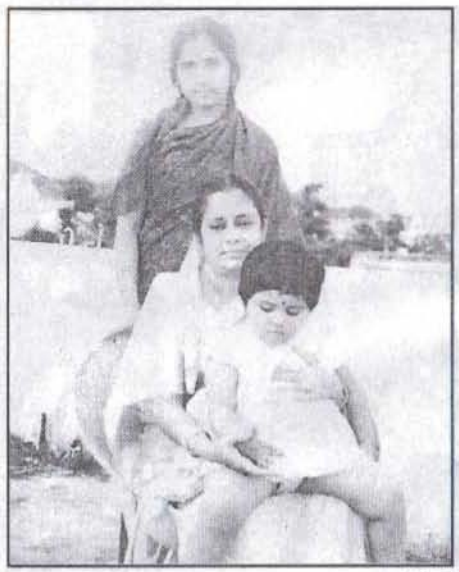

চট্টগ্রামে নাসিরাবাদের বাসার ছাদে (১৯৬৮) প্রথম দৌহিত্রী ডালিকে কোলে নিয়ে মা-মণি। পেছনে নাসরীন।

কাপ্তাই লেকে ভ্রমণরত মা-মণি, ফুফাতো ভাই মোকাররম হোসেন তৌহিদ, আব্বু ও নাসরীন।

নাসরীনের বিয়ের আসরে মা-মণি, পেছনে মিসেস ফজলে রাব্বি, জিনাত মাসুদ ও ডালি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উদিতা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা লগ্নে (১৯৭৭) মা-মণি ও সদস্যারা।

উদিতা ক্লাবে মা-মণির বিদায় অনুষ্ঠানে ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছেন ডা. মিসেস কাদের।

একই অনুষ্ঠানে রেজিস্ট্রার-পত্নী মিসেস জোয়ার্দার কর্তৃক উপহার প্রদান।

মা-মণির কোলে প্রথম ছেলে মেহরাবের প্রথম পুত্র আবীর।

ঢাকায় মন্ত্রীর বাঙলোয় মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে মা-মণি ও আব্বু।
মামণির পেছনে তাঁর ভাইঝি সানজিদা, পাশে দেবর-কন্যা লাইনো ও অন্যান্য স্বজনরা।

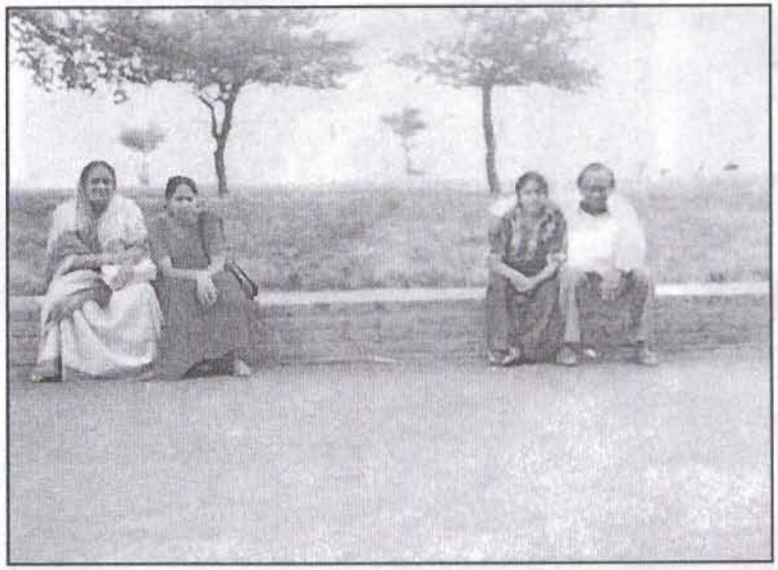

ন্যুইয়র্কে মা-মণি ও জিনাত, আব্বু ও ডালি।

কলাবাগানে জিনাত, আব্বু, মামণি, ডালি ও মাসুদ ভাই।

রাজশাহী ভ্রমণে আব্বু, মা-মণি, সঙ্গে নাসরীন ও তিন সন্তান – প্রসন্না, পূষণ ও পার্থ।

কলাবাগানের বাড়িতে মা-মণির জীবনের শেষ অনুষ্ঠান তাঁর জন্মদিন (১১ অক্টোবর ১৯৮২)।

একই অনুষ্ঠানে মিসেস (অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল) হাই, বেগম সুফিয়া কামাল, মা-মণি, ফজলে রাব্বি ও প্রকাশক মহিউদ্দিন আহম্মদ।

একই অনুষ্ঠানে দুই পুত্রবধূ রীতা (মিসেস মেহরাব) ও রুকু (মিসেস সিমাব)।

একই অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন মা-মণির বড় ছেলে মেহরাবের শিল্পকলা একাডেমীর সহকর্মী-বন্ধু এনায়েত-এ-মাওলা জিন্নাহ।

কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান শেলী।

কমর মুশতারী স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠরত সৈয়দ আলী রেজা।

কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনকে পুরস্কার দিচ্ছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক ওবায়দুল হক।

আব্বু ও মা-মণি : অন্যতম শেষ ছবি